নির্যাস

ব্র্যাকের গবেষণা তথ্যবিচিত্রা

খণ্ড ২২

আগস্ট ২০১১

গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ, ব্র্যাক

গ্রন্থস্বত্ব : ব্র্যাক

প্রকাশকাল : আগস্ট ২০১১

প্রকাশক : ব্র্যাক, গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ
৭৫ মহাখালী, ঢাকা ১২১২

সহযোগী সম্পাদক : আলতামাস পাশা

প্রচ্ছদ : সাজেদুর রহমান

অক্ষর বিন্যাস
ও অঙ্গসজ্জা : মো. আকরাম হোসেন

মুদ্রণ : ব্র্যাক প্রিন্টার্স
৮৭-৮৮ (পুরাতন) ৪১ (নতুন) ব্লক-সি
টঙ্গী শিল্প এলাকা, গাজীপুর ১৭১০

নির্যাসের এ সংখ্যাটিতে জিংক অপুষ্টি ও হারভেস্টপ্লাস-এর উপর একটি প্রতিবেদনসহ ২০০৯ সালের ২টি, ২০১০ সালের ৬টি এবং ২০১১ সালের ২টি বাছাইকৃত গবেষণা রিপোর্ট স্থান পেয়েছে।

মতামতের জন্য সম্পাদক বা প্রকাশক দায়ী নন। প্রবন্ধসমূহে উপস্থাপিত সকল মতামত গবেষক বা লেখকগণের একান্ত নিজস্ব।

সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদক : হাসান শরীফ আহমেদ
সদস্য : শফিকুল ইসলাম, বাবর কবির, আন্না মিন্‌জ,
ইশতিয়াক মহিউদ্দীন ও কাওসার আফসানা

Nirjash: Summary of selected BRAC research reports of 2009, 2010 & 2011 special report on Zinc fortified rice and a report on recent RED activities. Number 22, August 2011. Published by BRAC Research and Evaluation Division, 75 Mohakhali, Dhaka 1212, Bangladesh.

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়: কমিউনিটি রেডিও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে **১**

সাম্প্রতিক খবর **৬**

আর্থ-সামাজিক

ঢাকা শহরের ভাসমান জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা: একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন **১৩**

সিলেট বিভাগে শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসরতার কারণ **১৮**

সীমান্ত অঞ্চলে ব্র্যাকের কিশোর-কিশোরী উন্নয়ন কর্মসূচির কার্যকারিতা মূল্যায়ন **২৫**

ব্র্যাক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী ঝরে যাবার সামগ্রিক চিত্র: একটি গবেষণামূলক অনুসন্ধান **২৯**

অতিদরিদ্র খানাসমূহে মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্যসেবা পাবার সার্বিক চিত্র: একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন **৩৬**

পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থার ওপর একটি পর্যবেক্ষণ **৪৩**

গ্রামীণ বাংলাদেশে নারী-পুরুষ বৈষম্য এবং নারীর প্রতি সহিংসতার স্বরূপ নিরূপণ **৪৮**

স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক

নীলফামারী জেলার অভিজ্ঞতার আলোকে মাতৃত্বকালীন জটিলতা সম্পর্কে সুবিধাভোগীদের ধারণা এবং জরুরি সেবা পাবার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকর্মীদের ভূমিকা **৫২**

উন্নত পয়ঃনিষ্কাশনে ব্র্যাক ওয়াশ কর্মসূচির প্রভাব: বেইজলাইন থেকে মিডলাইন জরিপের পরিবর্তনসমূহ **৫৫**

স্বাস্থ্য সুরক্ষায় গ্রামাঞ্চলের মহিলাদের সাবান দিয়ে হাত ধোওয়ার প্রবণতা বেড়েছে **৬০**

বাংলাদেশে জিংক অপুষ্টি ও হারভেস্টপ্লাস কার্যক্রম **৬৩**

© BRAC

সম্পাদকীয়

কমিউনিটি রেডিও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রেডিও খুব শক্তিশালী একটি জনপ্রিয় মাধ্যম। গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সুবিধা বঞ্চিত মানুষের কাছেও রেডিও খুব সহজেই পৌঁছাতে পেরেছে। বর্তমানে মোবাইল ফোনে এফএম রেডিও শোনার সুবিধা থাকায় গ্রামাঞ্চলে রেডিও'র জনপ্রিয়তা এবং ব্যবহার আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে যারা লিখতে কিংবা পড়তে জানেন না তাদের কাছে তথ্য পৌঁছে দিতে রেডিও'র ভূমিকা আজ অনস্বীকার্য। সরকারের উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ অর্জনে রেডিও'র রয়েছে গৌরবময় ইতিহাস, যার ধারাবাহিকতা এখনো চলমান। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, গুটিবসন্ত প্রতিরোধ, ম্যালেরিয়া মুক্তকরণ, যক্ষ্মা প্রতিরোধ, পরিবার-পরিকল্পনা ও ইপিআইসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন কৌশল অবহিতকরণে রেডিও বিরামহীনভাবে অবদান রেখে চলেছে।

বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যাবলী অর্জনে অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ সকল লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এবং দারিদ্র্য বিমোচনে রেডিও ব্যবহারের কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সরকারি সম্প্রচারের পাশাপাশি কমিউনিটিভিত্তিক অলাভজনক সম্প্রচার ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

রেডিওখাতের পার্থক্যকরণ

রেডিও বহু ধরনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের শ্রোতার কাছে পৌঁছে থাকে। রেডিও সম্প্রচারকারীদের মধ্যে রয়েছে: ১. কমিউনিটি সম্প্রচারকারী, ২. বাণিজ্যিক সম্প্রচারকারী, ৩. সরকারি বা জাতীয় সম্প্রচারকারী এবং ৪. আন্তর্জাতিক সম্প্রচারকারী। এক্ষেত্রে কমিউনিটিভিত্তিক স্টেশনগুলো সাধারণত সীমিত প্রযুক্তি ও মানবসম্পদ নিয়ে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে তার অনুষ্ঠান সম্প্রচার

করে থাকে। কারণ এ ধরনের সম্প্রচারে সাধারণত স্বল্প শক্তিসম্পন্ন এফএম ট্রান্সমিটার ব্যবহার করা হয়, কেননা এই সম্প্রচারের পরিধিও কম হয়।

কমিউনিটি রেডিও

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উন্নয়নশীল বিশ্বে কমিউনিটি রেডিওর একটি ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। স্থানীয় পর্যায়ের চাহিদা ও বিভিন্ন বিষয়ে জনগণের মতপ্রকাশের সুযোগ করে দেওয়ার ক্ষেত্রে কমিউনিটি রেডিও'র ভূমিকা দাতাদেশগুলো কর্তৃক স্বীকৃতি পাচ্ছে। সেজন্য কমিউনিটি রেডিও কার্যক্রম দাতাদের কাছ থেকে তহবিল সহায়তাও পাচ্ছে। বর্তমানে দক্ষিণ আফ্রিকায় চালু রয়েছে প্রায় ১২০টি কমিউনিটি রেডিও। কমিউনিটি রেডিও গণ সম্প্রচার কার্যক্রম হিসেবে কাজ করে। এ রেডিও পুরো দেশব্যাপী না হয়ে নির্দিষ্ট অঞ্চলভিত্তিক হয়ে থাকে, অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট কমিউনিটির জন্য কমিউনিটি রেডিও'র কার্যক্রম পরিচালিত হয়। একটি কমিউনিটির নিজস্ব সম্পদ হচ্ছে কমিউনিটি রেডিও। এক্ষেত্রে উক্ত রেডিও'র কার্যক্রমে উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী বা কমিউনিটির মনোভাব, রীতিনীতি, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল এবং ধ্যানধারণা প্রতিফলিত হয়। নির্দিষ্ট কমিউনিটির আর্থসামাজিক উন্নয়নে উক্ত রেডিও অলাভজনকভাবে কোন সংগঠন বা ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত হয়।

আমাদের দেশে 'বাংলাদেশ বেতার' জাতীয় পর্যায়ে প্রায় সাত দশক ধরে তথ্য, বিনোদন ও শিক্ষার পাশাপাশি জন সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি জাতীয় উন্নয়নে সর্বস্তরের জনগণকে সম্পৃক্ত করার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে আসছে। অবাধ তথ্য প্রবাহের যুগে বহুমাত্রিক উপযোগিতার দাবি মেটাতে দেশে ব্যক্তি মালিকানায় বাণিজ্যিক এফএম বেতার কেন্দ্র চালু রয়েছে। নগরকেন্দ্রিক এ সকল চ্যানেল বিনোদন অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে থাকে। কিন্তু সমাজের একেবারে তৃণমূল পর্যায়ের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও জনগোষ্ঠীর জন্য সম্পূর্ণভাবে নিবেদিত কোনো বেতার এখনো দেশে গড়ে উঠেনি। উল্লেখ্য যে, কমিউনিটি রেডিও দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশ যেমন-ভারত, শ্রীলংকা ও মালয়েশিয়ায় চালু করা হয়েছে। এ বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রাণালয় ২০০৮ সালে কমিউনিটি রেডিও স্থাপন, সম্প্রচার ও পরিচালনায় নীতিমালা প্রণয়ন করে।

বাংলাদেশেও কমিউনিটি রেডিও আসছে

গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কাছে তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য পৌঁছে দিতে বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো কমিউনিটি রেডিও আসছে। দেশের বিভিন্ন এলাকায় পরীক্ষামূলকভাবে ১৪টি কমিউনিটি রেডিও'র অনুমোদন দিয়েছে সরকার। এসব বেতারকেন্দ্র দেশের উপকূলবর্তী এবং অনগ্রসর অঞ্চল থেকে সম্প্রচার কার্যক্রম চালাবে। এসব এলাকার মানুষের জীবনমান উন্নয়ন ও বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানোই হবে কমিউনিটি রেডিওর প্রধান লক্ষ্য। দেশের ১৩টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান অলাভজনকভাবে কেন্দ্রগুলো পরিচালনা করবে। কমিউনিটি রুরাল রেডিও বা কৃষি রেডিও নামের আমতলী উপজেলায় স্থাপিত রেডিওটি চালাবে কৃষি মন্ত্রণালয়।

আশা করা হচ্ছে কমিউনিটি রেডিও দেশের পিছিয়ে পড়া অঞ্চলের মানুষকে সচেতন করবে এবং উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করবে। যে কোন দুর্যোগকালীন বা জরুরি পরিস্থিতিতে এসব রেডিও মানুষের বেশি কাজে আসবে। সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কমিউনিটি রেডিও'র সম্প্রচার কাজ পরিচালিত হবে। মালিকানায় কোনো ব্যক্তি থাকবে না। এ রেডিও'র সম্প্রচার অনুষ্ঠানসূচিতে কমিউনিটি শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সমাজ, নারীর অধিকার, গ্রামীণ ও এলাকাভিত্তিক উন্নয়ন, পরিবেশ, আবহাওয়া ও সাংস্কৃতিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে। সম্প্রচারের ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে প্রাধান্য দেওয়া হবে।

রেডিও পল্লীকণ্ঠ – এফএম ৯৯.২০

এগিয়ে চলার কথা

কমিউনিটি রেডিও, মৌলভীবাজার

দেশের বৃহত্তম বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাক মৌলভীবাজার সদর উপজেলার চাঁদনীঘাট ইউনিয়নে 'রেডিও পল্লীকণ্ঠ' নামে একটি কমিউনিটি রেডিও স্থাপন, সম্প্রচার ও পরিচালনার অনুমোদন পেয়েছে।

'রেডিও পল্লীকণ্ঠ'-এর উদ্দেশ্যাবলী:

- তথ্য ও জ্ঞান আদান-প্রদানের একটি টেকসই ও সহজলভ্য মাধ্যম হিসেবে কাজ করা,
- তৃণমূল পর্যায় থেকে স্থানীয় গ্রামীণ জনগণের, বিশেষ করে নারীর কণ্ঠকে তুলে ধরা,
- গ্রামীণ উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা, এবং
- স্থানীয় লোকজ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে তুলে ধরা।

বিনোদন ও তথ্যের মাধ্যমে 'রেডিও পল্লীকণ্ঠ' গ্রামীণ জনগণের হাতের নাগালে পৌঁছে দেবে উন্নয়ন বার্তা। এখানে থাকবে কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, নারীর ক্ষমতায়ন, দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস, শিশু কল্যাণ, পরিবেশ, বিনোদন, স্থানীয় বাজার দর, সরকারি ও বেসরকারি সেবা সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যাবলী ও সংবাদ। অর্থাৎ 'রেডিও পল্লীকণ্ঠ-এর মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের তথ্যপ্রাপ্তি যেমন সহজলভ্য হবে তেমনি তা সমৃদ্ধ করবে স্থানীয় লোকজ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে।

'রেডিও পল্লীকণ্ঠ'-এর বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হবে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে। তারা রেডিওর অনুষ্ঠান পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, পরিচালনা, সম্প্রচার, মূল্যায়ন ও বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করবে। অর্থাৎ, এই অনুষ্ঠান তৈরি হবে স্থানীয় জনগণের জন্য, তাদের দ্বারা এবং তাদেরই সক্রিয় ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে। মূলত আঞ্চলিক ভাষায়, স্থানীয় গ্রামীণ প্রান্তিক ও দরিদ্র জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে নারী ও শিশুর উন্নয়নকে কেন্দ্র করে সম্প্রচারিত হবে রেডিও পল্লীকণ্ঠ-এর অনুষ্ঠানমালা। 'রেডিও পল্লীকণ্ঠ'-এর অনুষ্ঠান শোনা যাবে মৌলভীবাজার সদর উপজেলার রেডিও স্টেশন থেকে চারদিকে অন্তত ১৭ কিলোমিটার ব্যাসার্ধ জুড়ে। যা মৌলভীবাজার জেলার ৪টি উপজেলার ১৮টি ইউনিয়নের প্রায় ৪ লাখ জনগণ শুনতে পাবে।

ইতিমধ্যে তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'রেডিও পল্লীকণ্ঠ' নামটি অনুমোদিত হয়েছে। এছাড়াও রেডিও স্টেশনের জন্য স্টুডিও তৈরি করা, টাওয়ার নির্মাণ এবং রেকর্ডিং-এর যন্ত্রপাতি সহ আনুষঙ্গিক অন্যান্য যন্ত্রপাতি ক্রয় ও স্থাপন করা

হয়েছে। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) এর অনুমোদন সাপেক্ষে ব্রডকাস্টিং ট্রান্সমিটার ও অ্যান্টেনা আমদানি প্রক্রিয়াধীন। ব্রডকাস্টিং ট্রান্সমিটার ও অ্যান্টেনা প্রতিস্থাপনের পর তথ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে পরীক্ষামূলক সম্প্রচারের কাজ অতিসত্বর শুরু হবে। আমরাও কামনা করছি এ উদ্যোগ সফল হউক।

বর্তমানে, 'রেডিও পল্লীকণ্ঠ'-এ বিষয়ভিত্তিক যেমন- নারী অধিকার, বাল্য বিবাহ, নারীর স্বাস্থ্য ও সচেতনতা, কৃষি, শিক্ষা, স্থানীয় লোকজ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য, ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের উপর অনুষ্ঠান তৈরি করা হচ্ছে। আওতাধীন এলাকায় ব্র্যাক-এর পল্লী সমাজের সদস্য, গ্রাম সংগঠনের সদস্য, কিশোরী ক্লাব সদস্য এবং এলাকার অন্যান্য নারী-পুরুষ, যুবক-যুবতী, শিশু ও বয়স্কদের নিয়ে মোট ৭৬২টি শ্রোতাক্লাব গঠন করা হয়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশ বেতার সিলেট-এর সাথে অনুষ্ঠান বিনিময় ও কারিগরী সহায়তার ব্যাপারে যোগাযোগ করা হয়েছে।

বিশ্বের অনেক দেশেই কমিউনিটি রেডিও বহুল প্রচলিত এবং অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি গণমাধ্যম হলেও এ ধারণাটি বাংলাদেশে একেবারেই নতুন। বর্তমান সরকার তথ্যের অবাধ প্রবাহে বিশ্বাসী। সরকারের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে কমিউনিটি রেডিও'র কার্যক্রম যুক্ত করা গেলে প্রত্যন্ত এলাকার মানুষ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারীর অধিকার, পরিবেশ, আবহাওয়া ইত্যাদি বিষয়ে তাৎক্ষণিক তথ্য পাবার সুবিধা পাবে। আশা করা যাচ্ছে ব্র্যাক, প্রশাসন ও স্থানীয় জনগণের সক্রিয় ভূমিকার মাধ্যমে বাংলাদেশে কমিউনিটি রেডিও জনপ্রিয় হয়ে উঠবে এবং গণমানুষের তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

আলতামাস পাশা
মো. আজিজুর রহমান*
হাসান শরীফ আহমেদ

* কর্মসূচি ব্যবস্থাপক, ব্র্যাক সামাজিক ক্ষমতায়ন কর্মসূচি

সাম্প্রতিক খবর

'উদ্যোগ ও উন্নয়ন: অভিজ্ঞতা এবং নীতিনির্ধারণ' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

'উদ্যোগ ও উন্নয়ন: অভিজ্ঞতা, অনুশীলন এবং নীতিনির্ধারণ' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ওয়ারউইক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ক্রিস্টোফার উডরাফ। মঞ্চে বাম দিক থেকে উপবিষ্ট আছেন আলস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এসআর ওসমানী, সিপিডি-র ডিস্টিংগুইস্ড ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য্য, লন্ডন স্কুল অব ইকোনোমিক্স-এর অধ্যাপক রবিন বারজেস, সাবেক অর্থমন্ত্রী এম সাইদুজ্জামান এবং ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক ড. মাহবুব হোসেন।

উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মূলেই রয়েছে উদ্যোক্তার উদ্যোগ। ক্ষুদ্র উদ্যোগ কখনোবা সমাজের দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীর আয় বাড়াতে প্রধান উপায় হিসেবে উপস্থাপিত হয়, অন্যদিকে বৃহৎ সংস্থাসমূহের বৈশ্বিক বাজারে প্রতিযোগিতার জন্য রাষ্ট্রসমূহের সামর্থ্যও নির্ণায়ক হিসেবে বিবেচিত হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে ব্র্যাক, ইন্টারন্যাশনাল গ্রোথ সেন্টার (অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়) এবং ইম্প্রুভিং ইনস্টিটিউশন ফর প্রো পুওর গ্রোথ (লন্ডন স্কুল অব ইকোনোমিকস, ইউকে) আয়োজন করেছে 'উদ্যোগ ও উন্নয়ন: অভিজ্ঞতা, অনুশীলন এবং নীতিনির্ধারণ' শীর্ষক দু'দিনব্যাপী একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের। ঢাকার ব্র্যাক সেন্টার ইন মিলনায়তনে গত ২৭-২৮ মার্চ এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে দেশী-বিদেশী প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের মোট ১৬৫ জন শিক্ষাবিদ, নীতি-নির্ধারক এবং পেশাজীবী অংশ নেন।

বাংলাদেশ সরকারের সাবেক অর্থমন্ত্রী জনাব এম সাইদুজ্জামান উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। ওয়ারউইক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ক্রিস্টোফার উডরাফ সম্মেলনে 'Promoting micro-entrepreneurship in the developing world' শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। উক্ত সম্মেলনের বিভিন্ন অধিবেশনে আরো আটটি গবেষণা নিবন্ধ উপস্থাপিত হয়েছে।

ব্র্যাক সেন্টারে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা এবি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম। জনাব ইসলাম বলেন, ক্ষুদ্র ও অতিক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য পর্যাপ্ত বিনিয়োগ বা পুঁজির অভাব রয়েছে। এসব উদ্যোক্তাদের জন্য অর্থায়নসহ অন্যান্য বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে অনেক কিছু করার সুযোগ রয়েছে। ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক ড. মাহবুব হোসেন বলেন, দেশে কী পরিমাণ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা রয়েছে তার সঠিক পরিমাণ পাওয়া দুষ্কর। কেননা ক্ষুদ্র ও অতিক্ষুদ্র উদ্যোক্তা আনুষ্ঠানিকভাবে তৈরি হয় না। সাধারণত পরিবার পর্যায়ে এ ব্যবসা শুরু হয়। তিনি আরো জানান, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উদ্যোক্তাদের অর্থায়নের ওপর সুদের হার এখনো অনেক বেশি। সুদের হার আরো কমানো উচিত।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা অধ্যাপক ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ সমাপনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের গর্ভনর আতিয়ুর রহমান এ অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ব্র্যাক আন্তর্জাতিক-এর উপনির্বাহী পরিচালক ড. ইমরান মতিন দু'দিনব্যাপী সম্মেলনের সারাংশ উপস্থাপন করেন।

এই সম্মেলনে আলোচনার কেন্দ্রে ছিল ব্র্যাকের অতিদরিদ্র কর্মসূচির মূল্যায়ন। এই কর্মসূচির লক্ষ্য হচ্ছে অতিদরিদ্রদের মধ্যে উৎপাদনমুখী সম্পদের হস্তান্তর এবং সম্পদ পরিচালনা সংক্রান্ত দক্ষতা সৃষ্টি। অতিদরিদ্র কর্মসূচিটি বাংলাদেশে ব্যাপক পরিসরে বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং এটি বিভিন্ন উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে হুবহু অনুকরণও করা হচ্ছে। এই সম্মেলনে অতিদরিদ্র কর্মসূচি একটি মডেল হিসেবে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। অন্যান্য দেশে এই কর্মসূচির অনুকরণের সফলতা নিয়েও আলোচনা করা হয়। এই সম্মেলনে ক্ষুদ্র উদ্যোগকে বেগবান করার পথে প্রতিবন্ধকতা এবং এর বিকাশে সরকারের ভূমিকা ও সহায়ক নীতিমালা নিয়ে

বিস্তারিত আলোচনা হয়। মাঝারী উদ্যোগ ও শিল্প কারখানায় বিনিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের নীতিমালার ভূমিকা নিয়েও সম্মেলনে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

এডুকেশন ওয়াচ ২০০৯-২০১০ সালের প্রতিবেদন প্রকাশ

এডুকেশন ওয়াচ ২০০৯-২০১০-এর মোড়ক উন্মোচন। মঞ্চে বাম দিক থেকে গবেষক ও এডুকেশন ওয়াচ ওয়ার্কিং গ্রুপ-এর সদস্য সমীর রঞ্জন নাথ, সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র বদর উদ্দীন আহমদ কামরান, সংসদ সদস্য হাফিজ আহমদ মজুমদার, গণসাক্ষরতা অভিযান-এর নির্বাহী পরিচালক এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী, শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, সংসদ সদস্য ইমরান আহমেদ এবং এফআইভিডিবি'র নির্বাহী পরিচালক যেহীন আহমদ।

সিলেট শহরের একটি রেস্তোরায় গত ১৭ এপ্রিল 'এডুকেশন ওয়াচ ২০০৯-২০১০ - শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসরতার কারণ অনুসন্ধান: সিলেট বিভাগের ওপর একটি গবেষণা' শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের মোড়ক উন্মোচন করা হয় একটি অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। গণসাক্ষরতা অভিযান এবং বেসরকারি সংস্থা এফআইভিডিবি এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র বদর উদ্দিন আহমদ কামরান। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন এফআইভিডিবি'র নির্বাহী পরিচালক যেহীন আহমদ।

এডুকেশন ওয়াচ ২০০৯-২০১০ প্রতিবেদনের তথ্য ও নীতিসংক্রান্ত সুপারিশমালা উপস্থাপন করেন ব্র্যাক গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগের শিক্ষা ইউনিটের রিসার্চ কো-অর্ডিনেটর সমীর রঞ্জন নাথ। এই গবেষণা প্রতিবেদনে সিলেট বিভাগের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, সিলেটের মোট ভূমির ৩০.২% হাওর ও চা-বাগান এবং ১২.৫% বন-পাহাড়

অধ্যুষিত ভূমি। ভৌগোলিক দিক দিয়ে সুনামগঞ্জের প্রায় পুরোটাই হাওর এবং মৌলভীবাজারের পুরোটাই চা-বাগান অধ্যুষিত। এসব অঞ্চলের শিশুরা ভৌগোলিক কারণে এবং পারিবারিক আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে শিক্ষা থেকে পিছিয়ে পড়ছে। এই গবেষণায় আরো বলা হয়, সারা দেশে যেখানে ৬৫% শিশু ছয় বছর বয়সেই বিদ্যালয়ে যায়, সেখানে সিলেটে এই হার ৫২%। প্রতিবেদনে সিলেট অঞ্চলের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে হাওরের রাস্তাঘাট উন্নয়নের পাশাপাশি বর্ষা মৌসুমে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের জন্য 'বিশেষ ওয়াটার বাস সার্ভিস' চালু, অতিদরিদ্র এলাকায় উপবৃত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি, উপজেলাভিত্তিক সমস্যাকে প্রাধান্য দিয়ে শিক্ষা উন্নয়ন নীতিমালা তৈরি, শিক্ষকদের নিজেদের বাড়ির কাছাকাছি বিদ্যালয়ে নিয়োগসহ বেশ কিছু সুপারিশ করা হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন সিলেট শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ ছিল, এখনো আছে। তবে এই অঞ্চল ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে। সিলেটে বিদ্যালয়ে ভর্তির হার কম, অথচ ঝরে পড়ার হার বেশি। হাওর অঞ্চলে লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়া কঠিন, বর্ষা মৌসুমে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের স্কুলে যেতে সমস্যা হয়। শিক্ষানীতিতে হাওর অঞ্চল, চা-বাগান, পাহাড়ি অঞ্চল, আদিবাসী ও অতিদরিদ্রদের আলাদা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে মন্ত্রী জানান।

সংসদ সদস্য সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত বলেন, সিলেটের মধ্যে সুনামগঞ্জ একেবারেই পশ্চাদপদ। বোরো মৌসুমে হাওর এলাকার স্কুলছাত্র সহ সবাই মাঠে ধান কাটতে যায়। বর্ষা মৌসুমে নৌকার অভাবে এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামের স্কুলে যেতে শিক্ষার্থীদের দুর্ভোগ পোহাতে হয়। তাই অনগ্রসর অঞ্চলে নজরদারি বাড়াতে হবে।

সভাপতির বক্তব্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, 'যখনই শিক্ষা নিয়ে গবেষণা করি, তখনই সিলেটকে পিছিয়ে থাকতে দেখি। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য তথ্য দরকার'।

উক্ত অনুষ্ঠানে আরো অংশ নেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মো. সালেহ উদ্দিন, লিডিং ইউনিভার্সিটির উপাচার্য কবীর হোসেন, সিলেট শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান এসএম আবদুল খালেক, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা

নুরুল আমিন চৌধুরী, গোলাপগঞ্জ উপজেলা চেয়ারম্যান ইকবাল আহমদ চৌধুরী, জামালগঞ্জ উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান শামীমা শাহরিয়ার, সিলেট ব্লু-বার্ড স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষক লুৎফুন্নেসা লিলি প্রমুখ।

'বাংলাদেশে অনুপুষ্টিজনিত অপুষ্টি মোকাবিলায় জিংক সমৃদ্ধ ধান' শীর্ষক জাতীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত

ব্র্যাক ও বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউটের সহযোগিতায় হারভেস্টপ্লাস 'বাংলাদেশে অনুপুষ্টিজনিত অপুষ্টি মোকাবিলায় জিংকসমৃদ্ধ ধান' শীর্ষক একটি জাতীয় কর্মশালার আয়োজন করে গত ১১-১২ মে, ২০১১ তারিখে ঢাকার রূপসী বাংলা হোটেলে (প্রাক্তন ঢাকা শেরাটন হোটেল)। দু'দিনব্যাপী এই কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ওয়াইস কবির। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক ড. মাহবুব হোসেন।

এই কর্মশালায় দেশের সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ের ত্রিশজনেরও অধিক কৃষি বিজ্ঞানী, নীতি-নির্ধারক এবং পেশাজীবী হারভেস্টপ্লাসের গবেষণা নিয়ে আলোচনা করেন এবং জিঙ্কসমৃদ্ধ এই নতুনজাতের ধান আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্ত হওয়ার পর কী

করে তা দেশে দ্রুত সম্প্রসারণ করা যায় সেবিষয়ে পরামর্শ প্রদান করেন ও কর্মকৌশল নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, জিংক বা দস্তা মানবদেহের জন্য একটি অতি প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান। নারী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ সবার জন্যই জিংক প্রয়োজন। দৈনিক একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের প্রায় ৪ মিলিগ্রাম, একজন প্রাপ্তবয়স্ক মহিলার প্রায় ৩ মিলিগ্রাম, একজন শিশুর প্রায় ১-৩ মিলিগ্রাম ও একজন বাড়ন্ত বাচ্চার প্রায় ৩-৫ মিলিগ্রাম জিংক প্রয়োজন। গর্ভবতী এবং প্রসূতি মহিলাদের জিংক এর প্রয়োজন আরো বেশি। একজন গর্ভবতী মহিলার জন্য দৈনিক প্রায় ৩-৬ মিলিগ্রাম এবং প্রসূতি মহিলার জন্য দৈনিক প্রায় ৬ মিলিগ্রাম জিংক এর প্রয়োজন হয়। অনেক কম খেতে হয় বলে জিংককে অনুপুষ্টি বলা হয়। কিন্তু এরই অভাবে মানবদেহে মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। ছোট বাচ্চা এবং শিশুদের শরীরে জিংক এর অভাব হলে তাদের শারীরিক বৃদ্ধি হ্রাস পায় ফলে তারা চিরদিনের জন্য বয়সের তুলনায় খাটো হয়ে যেতে পারে।

আয়োজিত কর্মশালায় বিশেষজ্ঞরা জানান, প্রাণিজ আমিষের অভাবে বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শরীরে জিংকের অভাব প্রকট। জিংকের অভাবে মা ও নবজাতকের মৃত্যুও ঘটতে পারে। তাঁরা বলেছেন, জিংকসমৃদ্ধ ধান উদ্ভাবনের মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে।

অনুষ্ঠানে কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী নতুনজাতের ধান উৎপাদনে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বনের নির্দেশ দেন। নতুনজাতের জিংকসমৃদ্ধ ধানটির উৎপাদন ব্যয় যেন কৃষকের সাধ্যের মধ্যে থাকে এবং এর ভাত যেন উপাদেয় হয়, সেদিকেও লক্ষ্য রাখার পরামর্শ দেন তিনি।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ওয়ায়েস কবীর বলেন, সীমিত জমির অধিক ব্যবহারের কারণে মাটিতে প্রয়োজনীয় খনিজের ঘাটতি দেখা দিচ্ছে। দেশের সাড়ে আট মিলিয়ন হেক্টর চাষযোগ্য জমির অর্ধেকের বেশিতে জিংক প্রয়োজনীয় মাত্রার চেয়ে কম।

ব্রি-র প্রধান গবেষণা কর্মকর্তা মোঃ আলমগীর হোসেন বলেন, বর্তমানে জিংকসমৃদ্ধ ধানের পরীক্ষামূলক চাষ হচ্ছে দেশের কয়েকটি এলাকায়। এই ধানের

বীজ ২০১২ সাল নাগাদ চাষাবাদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া সম্ভব হবে। ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক ড. মাহবুব হোসেন বলেন, অধিকাংশ দরিদ্র পরিবার প্রতিদিন মাছ-মাংস খেতে পারে না। এ পরিবারগুলোতে জিংকের অভাবজনিত অপুষ্টি ব্যাপক। কিন্তু অপেক্ষাকৃত সস্তায় ভাত খাওয়া সম্ভব বলে ধানে পর্যাপ্ত পরিমাণে জিংক থাকলে সবাই এর সুবিধা পাবে।

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র বাংলাদেশের (আইসিডিডিআর,বি) পুষ্টি কর্মসূচির প্রধান তাহমিদ আহমেদ বলেন, শুধু পর্যাপ্ত জিংক সরবরাহ করা গেলে বছরে ৭০ হাজার শিশুর প্রাণ রক্ষা করা সম্ভব। জিংকের অভাবে বাংলাদেশের ৪৩ শতাংশ শিশু খর্বাকৃতি হয়। দু'দিনব্যাপী এই কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন ব্রি-র মহাপরিচালক মো. আবদুল মান্নান ও হারভেস্টপ্লাস-এর প্রোডাক্ট ডেলিভারি'র প্রধান হ্যারি হেনড্রিক্স।

বিশ্বব্যাপী এই সমস্যাটির সুলভ ও লাগসই সমাধানের জন্য এগিয়ে এসেছে একটি আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থা হারভেস্টপ্লাস। হারভেস্টপ্লাসের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রধান খাদ্য শস্যে অনুপুষ্টির উপাদান বৃদ্ধি করা। এই প্রক্রিয়াটি সংঘটিত হয় নির্বাচিত প্রজনন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। এটি কোন জিন প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়া নয়। এটাকে অভিহিত করা হয় বায়োফরটিফিকেশন নামে। হারভেস্টপ্লাস আন্তর্জাতিক কৃষি গবেষণা গ্রুপ (সিজিআইএআর) এর অন্তর্ভুক্ত একটি আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রকল্প। এটি ২০০৩ সালে স্থাপিত এবং ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত আন্তর্জাতিক খাদ্য নীতি গবেষণা প্রতিষ্ঠান (ইফরি) ও কলম্বিয়ায় অবস্থিত আন্তর্জাতিক উষ্ণ অঞ্চলীয় কৃষি গবেষণা কেন্দ্র (সিয়াট) এর যৌথ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। বিশ্বের চল্লিশটি দেশের ষাটটি সংস্থার দু'শোরও বেশি বিজ্ঞানী এই প্রকল্পের সাথে যুক্ত রয়েছেন।

বর্তমানে বাংলাদেশসহ নয়টি দেশে হারভেস্টপ্লাস গবেষণা করছে। এই গবেষণার আওতায় বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউটের গবেষকবৃন্দ জিংকসমৃদ্ধ একটি নতুন ধানের জাত আবিষ্কারের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন। আশা করা যায় যে, ২০১২ সাল নাগাদ জিংকসমৃদ্ধ ধানের বীজ চাষাবাদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া সম্ভব হবে। এই জাতটি অন্যান্য গুণাবলীতে জনপ্রিয় জাতসমূহের সমগুণ সম্পন্ন হবে। এখানে আরো উল্লেখ্য যে, হারভেস্টপ্লাস বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়, ব্র্যাক এবং আইসিডিডিআর,বি-এর সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করছে।

© BRAC নির্যাস ২০১১ আগস্ট;২২:১৩-১৭

ঢাকা শহরের ভাসমান জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা: একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন*

সৈয়দ মাসুদ আহমেদ, শামীম হোসেন, অন্তরা মাহমুদ খান, কাজী শাফায়েতুল ইসলমা ও মো. কামরুজ্জামান

- দারিদ্র্যই মূলত এইসব মানুষকে ঢাকা শহরে ভাসমান অবস্থায় থাকতে বাধ্য করছে। এদের ৩৬% ফুটপাথে ঘুমায়, অন্যরা রেলস্টেশন, স্টেডিয়াম, বস্তি, লঞ্চ টার্মিনাল, বাসস্ট্যান্ড বা বাজারে ঘুমায়।
- এদের ২২% দশ বছরেরও বেশি ঢাকার ফুটপাথে বাস করছে, ১৯% পাঁচ বছর, ৩৮% এক থেকে পাঁচ বছর ধরে বাস করছে।
- দিনমজুরি, ভিক্ষাবৃত্তি এবং টোকাই-এর কাজ করা হচ্ছে তাদের জীবিকার প্রধান উপায়।
- ভাসমান মানুষদের সাপ্তাহিক গড় আয় হচ্ছে ৮৪৯ টাকা। এক্ষেত্রে পুরুষদের আয় মহিলাদের চেয়ে বেশি। ভাসমান যৌনকর্মীদের সাপ্তাহিক গড় আয় হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ১,৩৭০ টাকা।

সূচনা

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সংজ্ঞানুসারে ভাসমান মানুষ বলতে তাদের বোঝায় যাঁরা রাস্তা, রেল স্টেশন, প্ল্যাটফর্ম, বাস-টার্মিনাল, পার্ক, উন্মুক্ত স্থান, নির্মানাধীন স্থাপনা, কবরস্থানের আশপাশ এবং অন্যান্য সরকারি স্থাপনায় রাত্রিযাপন করে। এদের মাথার উপর কোন ছাদ বা আচ্ছাদনও থাকে না। সোজা কথায় এসব মানুষ হচ্ছে ভাসমান ও ভবঘুরে যাদের স্থায়ী কোন থাকার জায়গা নেই। ঢাকা শহর

*'Lives and livelihoods on the streets of Dhaka city: Findings from a population based exploratory survey' (২০১০) শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ। সার-সংক্ষেপ করেছেন আলতামাস পাশা।

যেহেতু দেশের রাজধানী এবং জীবন-জীবিকার বিভিন্ন সুযোগ বিদ্যমান তাই ঘরবাড়িচ্যুত মানুষ জীবিকার সন্ধানে ব্যাপকভাবে ঢাকা শহরে ছুটে আসে। একটি গবেষণায় দেখা গেছে ঢাকা শহরে বছরে প্রায় ৩২০,০০০ ছিন্নমূল মানুষ অনুপ্রবেশ করে।

ব্র্যাক দীর্ঘদিন ধরে গরিব মানুষের ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ব্র্যাক শহরের বস্তি এলাকায় বসবাসকারী মানুষকেও তার কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করেছে। বস্তিবাসীদের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়াও শহরের ভাসমান ছিন্নমূল মানুষের জন্য যথোপযুক্ত কর্মসূচি প্রণয়নের লক্ষ্যে ব্র্যাক গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ সম্প্রতি ঢাকা শহরের ভাসমান মানুষের উপর একটি জরিপ করে। এই জরিপে ভাসমান মানুষের প্রয়োজন, জীবন-জীবিকা ও চাহিদা সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয় যাতে সঠিক তথ্য-নির্ভর কর্মসূচি গ্রহণ করা যায়। এ গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল ছয়টি। প্রথমত, ভাসমান মানুষের সামাজিক জনমিতিক অবস্থা এবং পূর্বের অর্থনৈতিক অবস্থা কী ছিল তা জানা; দ্বিতীয়ত, তাদের বর্তমান জীবনযাপন সম্পর্কে জানা; তৃতীয়ত, তাদের বর্তমান রুজি-রোজগার সম্পর্কে জানা; চতুর্থত, তাদের অসুস্থতা এবং স্বাস্থ্য সেবা পাওয়ার উপায় সম্পর্কে জানা; পঞ্চমত, পথে বাস করার ঝুঁকি এবং নিরাপত্তা বিষয়ক উৎকণ্ঠা সম্পর্কে অবহিত হওয়া; এবং ষষ্টত, ভাসমান মানুষের নিজস্ব চাহিদা সম্পর্কে অবহিত হওয়া। এ গবেষণাটি পরিচালিত হয় ঢাকা মহানগরীর শাহবাগ, হাইকোর্ট প্রাঙ্গন, কমলাপুর রেল স্টেশন, সায়দাবাদ, কারওয়ান বাজার, মিরপুর/গাবতলী, খিলগাঁও/বাসাবো, মহাখালী/গুলশান, গুলিস্তান/স্টেডিয়াম এবং সদরঘাট লঞ্চ ঘাট এলাকায়। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ছিল পথশিশু, ভাসমান যৌনকর্মী, দিনমজুর, মুটে, রিক্সা ও ভ্যান চালক এবং ভিক্ষুক। এক সপ্তাহ ধরে প্রতিটি নির্বাচিত স্থানে বার বার যাওয়া-আসার মাধ্যমে প্রতিটি এলাকা থেকে ১০০'র মতো ভাসমান মানুষকে নির্বাচন করা হয়। যেসব ভাসমান মানুষ একই স্থানে গত একমাস যাবৎ রাত্রিযাপন করেছে কেবলমাত্র তাদেরকেই এ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মোট ২০টি নির্ধারিত স্থান থেকে এ প্রক্রিয়ায় মোট ২,২৬৪ জন ভাসমান মানুষ এই জরিপের আওতায় নেয়া হয়।

গবেষণালব্ধ ফলাফল

এই জরিপে অংশগ্রহণকারীরা রাতের আশ্রয়স্থল (৮৬%), খাদ্যের সংস্থান (৪৬%) এবং কাজ পাবার নিশ্চয়তা (৪০%) না থাকাকে তাদের জীবনের সবচেয়ে বড় সমস্যা হিসেবে উল্লেখ করেছে। পানি, স্যানিটেশন সুবিধা, চিকিৎসা, পুলিশ ও মাস্তান কর্তৃক হয়রানি, নির্যাতন ইত্যাদি সমস্যার চেয়েও এসব সমস্যা ভাসমান মানুষকে বেশি চিন্তিত করে। এসব ভাসমান নারী-পুরুষের মধ্যে কর্মক্ষম মানুষের বয়সসীমা হচ্ছে ১৯ থেকে ৪০ বছর যার মধ্যে নারীদের সংখ্যাই বেশি। আবার নারীদের একটা বিশাল অংশ হচ্ছে বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা (৩০%) এবং স্বামী পরিত্যক্তা (১৯%)। ১৮ বছরের কম বয়সী শিশু হচ্ছে ২৫% এবং প্রায় ৭% হচ্ছে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। এসব ভাসমান মানুষের বেশির ভাগই নিরক্ষর, ১৬% পড়তে ও লিখতে পারে। এক-পঞ্চমাংশ পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা করেছে (পুরুষ এক-চতুর্থাংশ, নারী এক-দশমাংশ)। তাদের আয়ের প্রধান উপায় হচ্ছে দিনমজুরি (২৮%), ভিক্ষাবৃত্তি (২৪%) এবং টোকাই-এর কাজ (১৪%)। তারা সপ্তাহে গড়ে ৮৪৯ টাকা আয় করে এবং ৬৯২ টাকা ব্যয় করে। পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের আয় ও ব্যয় দুটোই কম। এদের মধ্যে পুরুষরা গড়ে ছয় বছর ধরে এবং মেয়েরা নয় বছর ধরে রাস্তায় জীবনযাপন করছে। দারিদ্র্যই ভাসমান জনগোষ্ঠীকে এই জীবন বেছে নিতে বাধ্য করেছে। মহিলাদের ক্ষেত্রে এ কথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

এসব মানুষ রাত্রিযাপন করে ফুটপাতে (৩৬%), রেল স্টেশনে (১৪%) এবং স্টেডিয়ামে (১৩%)। বর্ষাকালে তারা জায়গা পরিবর্তন করে এমন কোথাও যেতে চায় যেখানে মাথার ওপর সামান্য হলেও একটু আচ্ছাদন দেওয়া বা পাওয়া যায়। ভাসমান মানুষের বেশিরভাগই একা রাত্রিযাপন করে (২২%) অথবা অন্য ভাসমান মানুষের সঙ্গে থাকে। বেশিরভাগ মহিলা তাদের স্বামীর সঙ্গে (২৮%) এবং ছেলে-মেয়ের সঙ্গে থাকে (২৭%)। পুরুষদের ক্ষেত্রে এই হার হচ্ছে যথাক্রমে ১৩% এবং ০.৬%।

ফলাফল বিশ্লেষণে জানা যায় যে, ভাসমান মানুষরা প্রতিদিন গড়ে সাত ঘন্টারও বেশি সময় কাজ করে। সপ্তাহের ছয় দিনই তারা কাজ করে থাকে। দেখা গেছে ৭২% পুরুষ এবং ৫৫% নারী সাধারণত তিন বেলাই নিজেদের খাবারের সংস্থান করতে পারে। জরিপে অংশগ্রহণকারী ৬০% নারী-পুরুষ তাদের আয় থেকে সঞ্চয়

করে। পুরুষদের ২৬% এবং নারীদের ১৫% তাদের আয়ের একটি অংশ গ্রামে তাদের পরিবারে বা আত্মীয়স্বজনের কাছে পাঠায়।

ভাসমান মানুষদের দুই-তৃতীয়াংশ ওয়াসার পানি পান করে। পাবলিক টয়লেট ব্যবহার করে ৬২% এবং গোসলখানা ব্যবহার করে ৩৬%। পায়খানা করে সাবান ব্যবহার করে ৬৯% এবং গোসলের সময় সাবান ব্যবহার করে ৭৭%। কমপক্ষে এক-পঞ্চমাংশ ভাসমান মানুষ কোন কারণ ছাড়াই তাদের রাস্তায় থাকা জীবনে পুলিশী হয়রানির শিকার হয়েছে। মাদক ব্যবসার সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার কারণে বিভিন্ন সময়ে ২২% গ্রেফতার হয়েছে। আর ৩৬% ভাসমান নারী-পুরুষ শারীরিকভাবে নির্যাতিত হয়েছে।

অসুখবিসুখের ক্ষেত্রে দেখা যায় ৩৭% জরিপভুক্ত মানুষ জরিপের দু'সপ্তাহ পূর্বে অসুস্থ ছিল। ঠাণ্ডা লাগা সবচেয়ে বেশি ঘটেছে (২২%)। ডায়রিয়া ও আমাশয়ে ভুগেছে ১০% মানুষ। ওষুধের দোকানের কম্পাউন্ডারের কাছ থেকে চিকিৎসা নিয়েছে প্রায় ৮০% এবং সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছে ১০%। অন্যান্য অসুখের মধ্যে ছিল গ্যাসট্রিকের ব্যথা ১৯%, শ্বাসকষ্টজনীত সমস্যা ১৭%, এবং শরীর ব্যথা ১৩%। মাদকাসক্ত ছিল ২৪% পুরুষ এবং ৫% নারী। দাঁতের যত্নে তাঁরা টুথব্রাস ও পেস্ট ব্যবহার করলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ছাই ও কয়লা ব্যবহার করে বলে জানিয়েছে।

তাদের মধ্যে যৌনকর্মীদের সংখ্যা ৩% হলেও এ হার প্রকৃতপক্ষে আরো বেশি হবে, কারণ জরিপে এ পেশার সঙ্গে সম্পৃক্ততার কথা কেউ সোজাসুজি বলতে চায় নি। এখানে উল্লেখ্য যে, ভাসমান যৌনকর্মীদের সাপ্তাহিক গড় আয় হচ্ছে সবচেয়ে বেশি, ১,৩৭০ টাকা।

ভাসমান শিশুদের ৪০% বড় হয়ে কোন সম্মানজনক জীবিকা গ্রহণ করতে চায়। বিশেষত মেয়েদের এধরনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা বেশি। ছেলেশিশুদের ১৬% পরিবহন শ্রমিক হতে চেয়েছে, অপরদিকে মেয়েশিশুদের ১৮% পেশাজীবী যেমন চিকিৎসক, প্রকৌশলী বা শিক্ষক হতে চেয়েছে। বয়স, সাক্ষরতা এবং পথে ভাসমান থাকার সময়সীমা অনুসারে দেখা যায় যে, বয়স্ক মানুষরা বেশি কোণঠাসা হয়ে পড়েন ফুটপাতে ঘুমানোর ক্ষেত্রে, তিনবেলা খাদ্যের যোগানের ক্ষেত্রে এবং যেকোন স্থানে মলমূত্র ত্যাগের ক্ষেত্রে। তবে কমবয়স্কদের চেয়ে তারা বেশি সঞ্চয় করতে

পারেন। স্বাভাবিকভাবেই বয়স্করা অন্যান্যদের চেয়ে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে যায় বেশি। দেখা যায় ৭-১৮ বছরের শিশুরা অন্যান্যদের চেয়ে পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতার এবং শারীরিকভাবে নিগৃহীত হয় বেশি। যারা লিখতে ও পড়তে পারে তারা তিন বেলাই খাওয়া-দাওয়ার সংস্থান করতে সক্ষম। এরা পাবলিক টয়লেট ব্যবহার করে এবং বর্ষার সময় ঘুমাবার জায়গায় মাথার ওপর একটা আচ্ছাদনও দিতে পারে।

সুপারিশসমূহ

এই জরিপে ভাসমান মানুষের সমস্যার গভীরে যাবার জন্য তাদের চাহিদার প্রতি গুরুত্বারোপ করে আরো সমন্বিত জরিপের প্রস্তাবনা রেখে কতিপয় সুপারিশ করা হয়েছে। এসব সুপারিশে বলা হয়েছে, বিভিন্ন এনজিও ভাসমান শিশু ও যৌনকর্মীদের নিয়ে কাজ করার পরিপ্রেক্ষিতে ব্র্যাক প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধী ভিক্ষুকদের নিয়ে কাজ করতে পারে। উক্ত জরিপে আরো সুপারিশ করা হয়েছে যে, তাৎক্ষণিক ও স্বল্পকালীন কর্মসূচি হিসেবে রাত্রিকালীন আশ্রয়স্থল বানানো যেতে পারে যেখানে বিশুদ্ধ পানি, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ব্যবস্থা থাকতে পারে। এক্ষেত্রে নামমাত্র সার্ভিস চার্জ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। বিশেষত মহিলাদের সুবিধার জন্য ভ্রাম্যমান টয়লেটের ব্যবস্থা করতে অথবা নামমাত্র দামে বা বিনামূল্যে ঢাকা শহরের নির্দিষ্ট কিছু স্থানে স্যানিটারি টয়লেট বসানোর সুপারিশ করা হয়েছে। এসব ভাসমান মানুষের জন্য স্বাস্থ্যকর খাদ্য কমমূল্যে দেবার ব্যবস্থা করা যেতে পারে যাতে করে দূষিত খাদ্যজনীত রোগের প্রাদুর্ভাব কমে আসে। ভাসমান মানুষদের অসুখবিসুখ লেগে থাকার কারণে ভ্রাম্যমান স্বাস্থ্য ক্লিনিকের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা যেতে পারে। এ স্বাস্থ্যসেবায় যৌনরোগ ও প্রজননস্বাস্থ্যগত সেবাও অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। যেহেতু ভাসমান মানুষের অনেকেরই সঞ্চয় প্রবণতা রয়েছে, তাই এ সঞ্চয়কে কাজে লাগিয়ে এসব মানুষের আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যায়। এ ছাড়া মোটর গাড়ি মেরামত ওয়ার্কশপ, নির্মাণ শিল্প. হস্তশিল্প, গার্মেন্টস ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে যাতে করে ভাসমান কিশোর-কিশোরীরা ভবিষ্যতে বিভিন্ন শিল্প কারখানায় কাজ করে তাদের ভাসমান জীবনের সমাপ্তি ঘটাতে পারে। এজন্যে প্রয়োজন সমন্বিত রাজনৈতিক অঙ্গীকারের। আর এক্ষেত্রে বর্তমান জরিপটি সহায়ক হতে পারে।

নির্যাস ২০১১ আগস্ট;২২:১৮-২৪

সিলেট বিভাগে শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসরতার কারণ*

সমীর রঞ্জন নাথ, মো. মাহবুবুল কবির, কাজী সালেহ আহমেদ, গৌতম রায়, আওলাদ হোসেন, এসএম নুরুল আলম, ফজলুল করিম চৌধুরী ও আমিনা মাহবুব

- সিলেট বিভাগের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের কারণে যে আর্থিক অনগ্রসরতা ও সামাজিক অসমতা সৃষ্টি করে তা এই অঞ্চলের শিশুদের শিক্ষাকে নানাভাবে প্রভাবিত করে।
- সিলেট বিভাগের শিশুরা স্কুলে দেরিতে ভর্তি হয়, আবার আগাম ঝরে পড়ার হারও তাদের মধ্যে বেশি।
- এখানকার শিক্ষকদের মধ্যে সময়ানুবর্তিতার অভাব রয়েছে। তাঁরা দেরিতে স্কুলে আসেন আবার ছুটি হওয়ার আগেই বিদ্যালয় ত্যাগ করেন।

দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় শিক্ষাক্ষেত্রে সিলেট বিভাগ অনগ্রসর। এডুকেশন ওয়াচ-এর এই গবেষণায় শিক্ষাক্ষেত্রে সিলেট বিভাগের অনগ্রসরতার কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে। সিলেট বিভাগের জনসংখ্যা প্রায় নব্বই লক্ষ। সামাজিক, অর্থনৈতিক আর ভৌগোলিক দিক থেকে সিলেট বেশ বৈচিত্রপূর্ণ; এর বৈশিষ্টাবলী বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকা থেকে আলাদা। সিলেটের মোট ভূমির ৫৭.৫% সমতল, ৩০.২% হাওর অঞ্চল এবং ১২.৫% চা বাগান, বনভূমি, পাহাড় ইত্যাদি নিয়ে গঠিত।

সিলেটের প্রাথমিক শিক্ষালাভের উপযুক্ত বয়সী শিশুদের ৮০.৫% আর মাধ্যমিক শিক্ষালাভের উপযুক্ত বয়সী শিশুদের ৬৪.২% স্কুলে ভর্তি হয়। দুটি হারই এ সংক্রান্ত জাতীয় গড় হারের তুলনায় অনেক কম। জাতীয় গড় হারসমূহ যথাক্রমে ৮৬.৪% ও ৭৭.৭%। অনুরূপভাবে, স্কুলে পড়ালেখা করেছিল এমন জনসংখ্যার

*'Exploring low performance in education: the case of Sylhet division' (2009-10) শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ। সার-সংক্ষেপ করেছেন আলতামাস পাশা।

হার কিংবা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষালাভকারী জনসাধারণের হারের নিরিখেও সিলেট বিভাগের অবস্থান দেশের গড় অবস্থানের তুলনায় বেশ পেছনে। সাক্ষরতার হারের দিক থেকে সিলেটের অবস্থান সবার নিচে।

গবেষণার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি

শিক্ষার বিভিন্ন সূচকে সিলেট বিভাগ কেন দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে পিছিয়ে রয়েছে? সামাজিক, অর্থনৈতিক, আঞ্চলিক বা অন্য কোন বিষয় সিলেটের অগ্রগতির পথে বাধাস্বরূপ? এসব বাধাসমূহ কেন বিরাজ করছে এবং কীভবে এগুলো দূর করা যাবে? – আলোচ্য গবেষণায় এই বিষয়গুলো দেখার চেষ্টা করা হয়েছে।

খানা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কমিউনিটি জরিপ-এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই জরিপের আওতায় আনা হয়েছে। সিলেট বিভাগের চারটি জেলার গ্রামীণ এবং শহর এলাকার জন্য আলাদাভাবে তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। একই সঙ্গে সমতল ভূমি, হাওর এলাকা, এবং চা-বাগান/বনভূমি/পাহাড়-এর জন্যও আলাদা করে তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণার প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে ৩৪৪টি কমিউনিটি, ৭,৪৯৮টি খানা এবং ২৫৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে। এছাড়াও ৫৬টি সাক্ষাৎকার, ১২টি দলীয় আলোচনা, ৬৪টি কেস স্টাডি এবং ৮টি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেও তথ্য আহরণ করা হয়েছে। এই গবেষণাটির সব তথ্য সংগ্রহ করা হয় ২০১০ সালের মার্চ ও এপ্রিল মাসে।

গবেষণার ফলাফল

শিক্ষাক্ষেত্রে সিলেট বিভাগের অনগ্রসরতার বিবিধ কারণ এই গবেষণায় উঠে এসেছে যেগুলো পারস্পরিকভাবে সম্পর্কিত। কারণগুলোর বেশিরভাগই এমন নয় যে এগুলো শুধু সিলেটের জন্য প্রযোজ্য। সার্বিকভাবে বাংলাদেশের অনগ্রসর এলাকাগুলোর সঙ্গে এর সামঞ্জস্যতা রয়েছে। তবে একথা বলা যায় যে, কোনো কোনো কারণের ব্যাপকতা সিলেট বিভাগে বেশি এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে এগুলোর প্রকৃতিও হয়তো আলাদা মাত্রার।

ভৌগলিক অবস্থা

হাওর ও চা-বাগান এলাকার গৃহায়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও জনগণের পেশা সিলেটের অন্য এলাকা এবং দেশের বাদবাকি অঞ্চল থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং খুবই ঝুঁকিপূর্ণ ও নিম্নমানের। এসকল ক্ষেত্রে ঋতুভেদে ভিন্নতাও দেখা যায়। দেখা গেছে, সিলেটের শহরাঞ্চল (মহানগর ও পৌরসভাসমূহ) ব্যতীত পুরো জনপদেই শিশুদের বিদ্যালয়ে অভিগম্যতার হার জাতীয় পর্যায়ের গড় হারের তুলনায় কম। সুনামগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলায় এবং চা-বাগান এলাকায় এই হার জাতীয় গড় হারের অনেক নিচে। আর্থিক অনগ্রসরতা এবং সামাজিক অসমতা আর বৈষম্যের কারণে এই অঞ্চলের শিশুরা বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় কম। যারা ভর্তি হয় তারাও একই কারণে পড়ালেখা চালিয়ে নিতে পারে না। যদিও গড় হিসেবে সিলেট বিভাগের আর্থিক অবস্থা বাংলাদেশের অন্য বিভাগগুলোর তুলনায় ভালো কিন্তু ভৌগোলিক বিভিন্নতার কারণে এখানে অসম বিন্যাসের সম্ভাবনা খুব বেশি।

শিশুদের বিলম্বে ভর্তি ও আগাম ঝরে পড়া

তুলনামূলকভাবে সিলেট বিভাগের শিশুরা দেরিতে স্কুলে ভর্তি হয়, আবার আগাম ঝরে পড়ার হারও তাদের মধ্যে বেশি। সিলেটের সকল বয়সের শিশুদের নিট ভর্তি হার জাতীয় হারের চেয়ে কম। যেখানে বাংলাদেশের ছয় বছর বয়সী শিশুদের ৬৫% স্কুলে ভর্তি হয় সেখানে সিলেট বিভাগে এই হার ৫২%। শিশুর বয়স ১৫ বছর হতেই সমতল ভূমির অর্ধেক শিশু, হাওর অঞ্চলের ৬০% এবং চা বাগান, পাহাড় ও বনভূমির ৭৩% শিশু বিদ্যালয়-বহির্ভূত শিশুতে পরিণত হয়। এ সংক্রান্ত তুলনামূলক জাতীয় হার ৪০%-এরও নিচে। ঝরে পড়া শিশুদের একটি অংশের পরিবার পড়ালেখার ব্যয়ভার বহন করতে একেবারেই পারে না। আর অন্যরা অল্প বয়সেই আয়-উপার্জনের জন্য নানা ধরনের কাজে যোগ দেয়।

কমিউনিটির সচেতনতা

ভর্তির উপযুক্ত বয়সী শিশুদের মা-বাবারা শিক্ষার গুরুত্ব বোঝেন। এমনকি দরিদ্র শ্রেণীর মা-বাবাদের ক্ষেত্রেও শিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহের কমতি নেই। কিন্তু তারা যখন শিশুর শিক্ষালাভকে তাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সঙ্গে তুলনা

করেন তখন অনেক ক্ষেত্রেই দ্বিতীয়টি প্রাধান্য পায়। এ কারণেই সিলেটের গ্রামাঞ্চলগুলোতে শিশুশ্রমের ব্যাপক প্রাধান্য দেখা গেছে। এই শিশুদের কেউ অর্থের বিনিময়ে আবার কেউবা বিনামূল্যে শ্রমদান করে। এর সঙ্গে যোগ হয় উন্নত জীবনের প্রত্যাশায় বিদেশ যাবার আকাঙ্ক্ষা, বিশেষত যুক্তরাজ্যে।

শিক্ষাসংক্রান্ত সুবিধাদি

সিলেট বিভাগে প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কমতি নেই কিন্তু অভাব রয়েছে মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের। দেখা গেছে, দেশের মোট প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৭.৮% আর মোট মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৩.৯% সিলেট বিভাগে অবস্থিত। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের বিদ্যালয় গমন উপযোগী বয়সের শিশুদের ৬.৪% সিলেট বিভাগে বসবাস করে।

শিক্ষকবৃন্দের অনুপস্থিতি ও সময়ানুবর্তিতা

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই শিক্ষকস্বল্পতা রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে গড় শিক্ষক ৪.৪ জন এবং মাধ্যমিকে ১২.৮ জন। শিক্ষাগত যোগ্যতা ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে সিলেট বিভাগের শিক্ষকগণ দেশের অন্যান্য অঞ্চলের শিক্ষকদের সমপর্যায়ে রয়েছেন। নারী শিক্ষকের অনুপাত সিলেটে বেশি। কিন্তু দেখা গেছে, গ্রামীণ বিদ্যালয়গুলোর এক-চতুর্থাংশ শিক্ষক শহরে বসবাস করেন। বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকা, দেরিতে উপস্থিত হওয়া ও ছুটির আগেই বিদ্যালয় ত্যাগ করার ক্ষেত্রে সিলেট বিভাগের শিক্ষকরা তুলনামূলকভাবে এগিয়ে রয়েছেন। জরিপ চলাকালীন প্রাথমিক শিক্ষকদের ২১.৬% এবং মাধ্যমিক শিক্ষকদের ১২.৪% বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত ছিলেন যা সারাদেশের গড় হারের তুলনায় বেশি। সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ এবং মৌলভীবাজার জেলার গ্রামীণ বিদ্যালয়সমূহের অবস্থা সবচেয়ে শোচনীয়।

ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা

যথাযথভাবে বিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি এবং উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের কর্মোদ্যোগ খুব কমই দেখা গেছে। বেশ কিছু

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গত এক বছরে একবারও পরিদর্শক আসেন নি। আবার বেশ ক'টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাত্র এক বা দুইবার পরিদর্শন করা হয়েছে, যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। প্রায় ৭৩% প্রাথমিক বিদ্যালয় ২০০৯ সালে একবারও পরিদর্শন করা হয় নি। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার বিবরণী পর্যালোচনা করে শিক্ষকদের সময়ানুবর্তিতার অভাবের বিষয়ে কোনো আলোচনা হয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায় নি।

অনাবাসী বাংলাদেশী

সিলেটের আয়-উপার্জনে অনাবাসী বাংলাদেশীদের বড় ভূমিকা রয়েছে। জরিপকৃত খানাগুলোর প্রায় এক-পঞ্চমাংশের কমপক্ষে একজন সদস্য অনাবাসী বাংলাদেশী। তাদের পাঠানো অর্থের খুব সামান্য অংশই সাধারণ শিক্ষার উন্নয়নে ব্যয় করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে মাদ্রাসাগুলো অগ্রাধিকার পেয়েছে। গবেষণায় আরো দেখা গেছে যে, যেসব খানায় অনাবাসী বাংলাদেশী সদস্য রয়েছে সেসব খানায় সাধারণত বিদ্যালয়ে অভিগম্যতার হার বেশি। এ প্রবণতা প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ, মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নয়।

স্থানান্তরিত খানা

এ গবেষণায় এমন কোনো আলামত পাওয়া যায় নি যা থেকে বোঝা যাবে যে, সিলেটের সামাজিক ও শিক্ষাসংক্রান্ত উন্নয়ন বা অবনয়নে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সিলেট বিভাগের মোট খানার ৩.৬% সিলেটের এক স্থান থেকে অন্যস্থানে বসতি স্থাপন করেছে। এ সকল খানার শিশুদের বিদ্যালয়ে অভিগম্যতার হার অন্যদের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় শিক্ষার উপযোগী বয়সী শিশুদের মধ্যে একই ধরনের প্রবণতা দেখা গেছে।

মাদ্রাসার ভূমিকা

সিলেট বিভাগের শিশুদের মধ্যে মাদ্রাসায় ভর্তি হওয়ার প্রবণতা তুলনামূলকভাবে একটু বেশি। মাদ্রাসায় সাধারণ বিদ্যালয়ের তুলনায় ভালো পড়ালেখা হয় এমন ধারণা থেকেই মা-বাবাদের একটি অংশ সন্তানদের মাদ্রাসায় ভর্তি করান।

শিক্ষাক্ষেত্রে বিনিয়োগ

সিলেট বিভাগে প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দেশের অন্যান্য এলাকার মতোই, যদিও গবেষণাভুক্ত ৪২% গ্রামে কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয় পাওয়া যায় নি। মাধ্যমিকের ক্ষেত্রেও সিলেট অনেকটা পিছিয়ে রয়েছে। যদিও মাধ্যমিক স্তরে পড়ালেখা করার উপযোগী শিশুদের ৬.৪% সিলেট বিভাগে বসবাস করে তথাপি দেশের মোট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৩.৯% সিলেট বিভাগে অবস্থিত।

নীতিসংক্রান্ত সুপারিশমালা

শিক্ষাক্ষেত্রে সিলেটের অনগ্রসরতার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে এই গবেষণায় এককভাবে তাৎপর্যপূর্ণ কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় নি। অনুসন্ধানে যে কারণগুলো পাওয়া গেছে তার বেশিরভাগই বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসরতার মৌলিক কারণগুলোর প্রতিচ্ছবি মাত্র। এ ক্ষেত্রে সমাধান খুঁজে পেতে হবে সার্বিকভাবে জাতীয় কৌশল ও অনগ্রসর এলাকাকে প্রাধান্য দেয়ার মধ্যে।

এক্ষেত্রে কতিপয় সুপারিশ হলো:

- উপজেলা এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পর্যায়ে শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নিতে হবে। উভয় পর্যায়েই পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সরকারের একটা সাধারণ দিকনির্দেশনা থাকতে পারে। চা-বাগানে শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় বাগান ব্যবস্থাপকদের অংশগ্রহণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
- হাওর এলাকায় যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রয়োজন।
- শিক্ষা প্রসারে সরকার ও নানা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের যেসব ইতিবাচক কর্মসূচি রয়েছে সেগুলো সিলেটের কোনো কোনো অঞ্চলে বর্ধিত আকারে বিস্তৃত করা যেতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে উপবৃত্তি ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি। যেসব এলাকায় শিক্ষার্থী ভর্তির হার কম এবং আগাম ঝরে পড়ার হার বেশি সেসব এলাকায় উপবৃত্তির পরিমাণ ও সংখ্যা উভয়ই বাড়ানো যেতে পারে।

- সিলেট বিভাগের গ্রামীণ উপজেলাসমূহে আরো বেশি সংখ্যক শিক্ষা কর্মকর্তার পদ সৃষ্টি করে অনতিবিলম্বে তাদের নিয়োগ দেওয়া দরকার।

- যেসব বিদ্যালয়ে শিক্ষকস্বল্পতা রয়েছে যেখানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া দরকার। শিক্ষকরা যেন বিদ্যালয়ের কাছাকাছি বসবাস করেন সেজন্য তাদের উৎসাহ প্রদান করা প্রয়োজন। স্থানীয়ভাবে অধিকসংখ্যক অস্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে শিক্ষক স্বল্পতা নিরসনের দ্রুত একটা উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে।

- শিশুদের শিক্ষার প্রতি মা-বাবার দায়িত্ববোধ বাড়ানো এবং শিক্ষকদেরকে তাদের কাজের প্রতি আরো জবাবদিহি করার লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে বিদ্যালয় পর্যায়ে অভিভাবক-শিক্ষক সভার আয়োজন করা দরকার। মা-বাবার সঙ্গে বিদ্যালয়ের যোগাযোগ বাড়ানোর ক্ষেত্রে এবং সার্বিকভাবে জবাবদিহিতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে বিদ্যালয় ব্যস্থাপনা কমিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

- চা-বাগানমূহ এবং দুর্গম হাওর এলাকায় যেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্বল্পতা রয়েছে সেখানে নতুন বিদ্যালয় স্থাপন করা দরকার। স্থায়ী ও আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয় স্থাপন যদি সময়সাপেক্ষ হয় তবে অস্থায়ী ভিত্তিতে উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয় স্থাপনের কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। সরকারের আর্থিক সহায়তা নিয়ে স্থানীয় ও জাতীয় স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং বেসরকারি উদ্যোক্তারা একাজ করতে পারেন।

- সিলেটের শিক্ষা উন্নয়নে আরো বেশি অবদান রাখতে অনাবাসী বাংলাদেশীদের উৎসাহিত করতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার। এমন ব্যবস্থা নেওয়া দরকার যেন একটা যৌথ ও সমন্বিত কর্মোদ্যোগের সৃষ্টি হয়। সরকারি উদ্যোগে সিলেট বিভাগের জন্য বিশেষ শিক্ষা তহবিল গঠন করা যেতে পারে যেখানে সরকার ও অনাবাসী বাংলাদেশীরা নিজ নিজ অবদান রাখবেন।

 নির্যাস ২০১১ আগস্ট;২২:২৫-২৮

সীমান্ত অঞ্চলে ব্র্যাকের কিশোর-কিশোরী উন্নয়ন কর্মসূচির কার্যকারিতা মূল্যায়ন*

জিন্নাত আরা ও নারায়ণ চন্দ্র দাস

রাষ্ট্রের উন্নয়নের জন্য কিশোর-কিশোরীরা হচ্ছে বড় সম্পদ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (২০০৮) তথ্যানুসারে এদেশের মোট জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ হচ্ছে কিশোর-কিশোরী (১১-১৯ বছর)। তাদের জীবন-জীবিকা ও দক্ষতার উন্নয়নে এবং তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে গড়ে তুলতে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়সমূহ যথাযথ গুরুত্ব সহকারে অনুসরণ করা উচিত। তবেই কিশোরী-কিশোরীদের দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তর সম্ভব এবং তারা দেশের সার্বিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

মূলধারার উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত না হবার কারণে সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষ ব্যাপকভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে পিছিয়ে রয়েছে। সীমান্ত অঞ্চলে ব্র্যাক-এর কিশোর-কিশোরী উন্নয়ন কার্যক্রম (Adolescent Development Programme বা এডিপি) চালু হয় ২০০৮ সালে। সীমান্তসংলগ্ন যেসব এলাকায় কোন এনজিওর কার্যক্রম নেই এমন ছয়টি জেলার (যশোর, জামালপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, সিলেট, কক্সবাজার ও দিনাজপুর) কতিপয় গ্রামে ব্র্যাক এই কার্যক্রম চালু করে। এসব অঞ্চল সীমান্তের সন্নিকটে থাকায় এইচআইভি/এইডস সংক্রমণে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয়। এ অঞ্চলের মানুষকে এ সম্পর্কে সচেতন করতে এডিপি কর্মসূচির আওতায় কিশোর-কিশোরীদের সামাজিক ও আইন বিষয়ক (বিবাহসংক্রান্ত, যৌতুক ইত্যাদি), যাতায়াত এবং জেন্ডার সমতা ইত্যাদি বিষয়ে সচেতন করার পাশাপাশি

* 'Impact assessment of adolescent development programme in the selective border regions of Bangladesh' (২০১০) শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ। সার-সংক্ষেপ করেছেন আলতামাস পাশা।

এইচআইভি/এইডস সম্পর্কেও অবহিত করা হয়। সাধারণত গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে বাল্যবিবাহ দেয়ার প্রবণতা বেশি থাকায় তাদের অভিভাবকদের জন্য জেন্ডার সমতা বিষয়ক সভার আয়োজন করা হয়।

গবেষণার উদ্দেশ্য

আলোচ্য গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল সীমান্ত অঞ্চলে এডিপি কর্মসূচির প্রভাব নিরূপণ করা। এই গবেষণায় কিশোর-কিশোরীদের সামাজিক ও আইন বিষয়ে সচেতন করতে, তাঁদের কাজ-কর্মে গতিশীলতা আনতে এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে এ কর্মসূচির প্রভাব সম্পর্কে অনুসন্ধান করা হয়। কিশোর-কিশোরীদের অভিভাবকদের জেন্ডার সমতা সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গিতে কী পরিবর্তন এসেছে তাও জানার চেষ্টা করা হয়েছে। অন্যান্য এলাকায় পরিচালিত এডিপি কর্মসূচি এবং সীমান্ত অঞ্চলে পরিচালিত এডিপি কর্মসূচির মধ্যে প্রধান পার্থক্যসমূহ হচ্ছে নিম্নরূপঃ

১. সাধারণত যেখানে ব্র্যাকের শিক্ষা কর্মসূচি রয়েছে যেখানে এডিপি পরিচালিত হয় এবং ব্র্যাক স্কুলের শ্রেণীকক্ষগুলো কিশোরী ক্লাব হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এই কিশোরী ক্লাবের মাধ্যমে এডিপি তার সকল কার্যক্রম পরিচালিত করে। কিন্তু সীমান্ত অঞ্চলে এডিপি কর্মসূচি পরিচালিত হয় যেখানে পূর্বে ব্র্যাক-এর কোন কর্মসূচি ছিল না ।

২. সাধারণত এডিপি কর্মসূচিতে কিশোর-কিশোরীদের জীবন-জীবিকার উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, কিন্তু সীমান্ত অঞ্চলে পরিচালিত এডিপিতে শুধুমাত্র জীবনদক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

৩. সীমান্ত অঞ্চলে এডিপি কার্যক্রম পরিচালনায় মাস্টার ট্রেইনার তৈরি করা হয় যা একটি নতুন বিষয়। এইচআইভি/এইডস-এর উপর অডিও-ভিজুয়াল সামগ্রী, জেন্ডার সমতার বিষয়ক তথ্য সামগ্রী এবং মেয়েদের শিক্ষাপ্রদান সামগ্রী প্রথম বারের মত এই কার্যক্রমের জন্য তৈরি করা হয়েছে। এসব সামগ্রী দেশের অন্যান্য এলাকায় এডিপি কর্মসূচিতে ব্যবহৃত হয় না।

এ গবেষণায় ২০০৮ সালের বেইজলাইন এবং ২০১০ সালের ফলো-আপ জরিপের উপাত্ত ব্যবহার করা হয়েছে।

ফলাফল

কিশোর-কিশোরী এবং তাদের অভিভাবকদের সার্বিক সচেতনতা বাড়াতে এ কর্মসূচির ইতিবাচক প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে। দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণের কারণে কিশোর-কিশোরীদের সক্ষমতা বেড়েছে। অন্যদিকে বিবাহের আইনসিদ্ধ বয়স এবং বিবাহ সম্পর্কিত সচেতনতা কিশোর-কিশোরী ও তাদের অভিভাকদের এখনও নিম্ন পর্যায়েই রয়েছে।

সীমান্ত অঞ্চলের কিশোর-কিশোরীদের সামাজিক ও আইন বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে এই কর্মসূচির তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। এইচআইভি/এইডস সম্পর্কে সচেতনতাও বেড়েছে। বেকার যুবকদের অসামাজিক কার্যক্রমে যুক্ত হবার প্রবণতা বেশি থাকার কারণে এই কর্মসূচির আওতায় কিশোর-কিশোরীদের জীবনদক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হয় শুধুমাত্র আয়মূলক কাজের সাথে জড়িত হবার জন্যই নয় বরং সমাজে বিশৃঙ্খলা দূর করার জন্যও। এই প্রশিক্ষণ কাজে লাগিয়ে কিশোর-কিশোরীরা আয়-বর্ধনমূলক কার্যাবলীতে আরো বেশি অংশ গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে। স্বাস্থ্য কেন্দ্রসমূহে, খেলার মাঠে ও বন্ধুদের বাসায় কিশোর-কিশোরীদের ব্যাপক যাতায়াত এই কর্মসূচির গতিশীলতার পরিচয় বহন করে। সমাজের সামগ্রিক উন্নতির জন্য জেন্ডার সমতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই গবেষণায় দেখা গেছে কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের ফলে জেন্ডার সমতার প্রতি তারা আরো সচেতন হয়েছে এবং তাদের মনোভাবের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে।

গবেষণার কেস স্টাডি থেকে দেখা যায় সামাজিক বিভিন্ন ইস্যুতে তাদের সচেতনতা বেড়েছে। তারা মনে করে এই কর্মসূচি অব্যাহত রাখা উচিত। তবে মোটামুটিভাবে কর্মসূচির ইতিবাচক প্রভাব দেখা গেলেও বহু বিষয়েই যেমন বিবাহের আইনসিদ্ধ বয়স ও বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পর্কিত বিষয়ে কিশোর-কিশোরী এবং তাদের অভিভাবকদের সচেতনতা এখনও খুব কম।

সীমান্ত অঞ্চলে এডিপি কর্মসূচির জন্য একটি নিরাপদ ও স্থায়ী জায়গা নির্ধারণ করা উচিত যেখানে কিশোর-কিশোরীরা সমবেত হতে পারে এবং খেলাধুলা ও লেখাপড়ায় তাদের সময় অতিবাহিত করতে পারে। এ স্থানটিতে বিভিন্ন সচেতনতামূলক লেখা সম্বলিত পোস্টার এবং লিফলেট/পুস্তিকা প্রদর্শনের জন্য

রাখা যেতে পারে। সকল স্তরের জনসাধারণের মাঝে প্রচারের জন্য আরো বেশি লিফলেট/পুস্তিকা বা পোস্টার কিশোর-কিশোরীদের কাছে দিতে হবে। তারা এসব প্রচার সামগ্রী তাদের ঘরে এবং অন্যান্য জনসমাগমমূলক স্থানে দৃষ্টিগোচরভাবে লাগিয়ে রাখতে পারে। এতে সব শ্রেণীর মানুষের মাঝে সচেতনা বৃদ্ধি পাবে।

© BRAC

ব্র্যাক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী ঝরে যাবার সামগ্রিক চিত্র: একটি গবেষণামূলক অনুসন্ধান*

আশ্রাফুজ্জামান খান ও মৃন্ময় সমদ্দার

- শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ এবং বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরণ পাওয়া ব্র্যাক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া চালিয়ে যেতে ছাত্র-ছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকদের উৎসাহিত করে।
- তৃতীয় শ্রেণীতে পৌঁছানোর পরে ছাত্র-ছাত্রীদের ঝরে যাবার হার বৃদ্ধি পায় কারণ পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু কঠিন বলে মনে হয়।
- পার্বত্য চট্টগ্রামের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিদ্যালয়ের দূরত্ব আর যানবহনের অভাব একটি বড় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়।

এই গবেষণায় ব্র্যাক প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের ঝরে যাওয়ার কারণ অনুসন্ধান করা হয়। এসব ছাত্র-ছাত্রীরা ব্র্যাক প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাড়া অন্য কোন বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় না। এ গবেষণায় উপাত্ত সংগৃহীত হয় দু'টি ধাপে। প্রথম পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীদের ঝরে যাবার অনুপাত জানতে ৬৮১টি বিদ্যালয়ে জরিপ চালানো হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে উক্ত ৬৮১টি বিদ্যালয় থেকে ১২৮টি বিদ্যালয় নির্বাচন করা হয় দৈবচয়নের মাধ্যমে।

ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহর এবং বান্দরবন ও রাঙামাটি জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ এ গবেষণার অন্তর্ভুক্ত ছিল। যে ৬৮১টি বিদ্যালয়ে জরিপ পরিচালিত হয় সেসব বিদ্যালয়ে সার্বিকভাবে ছাত্র-ছাত্রী ঝরে যাবার হার ছিল ৬.১৩%।

* 'Beyond dropout: a study on BRAC primary school' (২০১০) শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ। সার-সংক্ষেপ করেছেন আলতামাস পাশা।

এই গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ ছিল:

১. ছাত্র-ছাত্রী ঝরে যাবার প্রেক্ষিতে ব্র্যাক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বর্তমান অবস্থা জানা
২. ঝরে পড়ার সঙ্গে যুক্ত বিষয়সমূহ নির্ধারণ করা
৩. ঝরে পড়ার আঞ্চলিক কারণসমূহ নির্ণয় করা
৪. বর্তমান ঝরে যাবার অঞ্চলভিত্তিক অবস্থা জানা এবং ব্র্যাক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেসব ছাত্র-ছাত্রী তাদের শিক্ষা অব্যাহত রেখেছে তাদের সম্পর্কে অবগত হওয়া।
৫. ঝরে যাওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকদের সঙ্গে বিদ্যমান ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকদের দৃষ্টিভঙ্গির তুলনা করা।

গবেষণালব্ধ ফলাফল:

ঝরে পড়ার কারণসমূহ

ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরের এবং বান্দরবন ও রাঙামাটি জেলার ১২৮টি বিদ্যালয়ে এই গবেষণাটি পরিচালিত হয়। ব্র্যাক প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের ঝরে যাবার পাঁচটি কারণ চিহ্নিত করা হয়। এগুলো হচ্ছে: পারিবারিক (৫৩.৩%), ব্যক্তিগত (৩৪.২%), শিক্ষাগত (১৮.১%), বিদ্যালয় সংক্রান্ত (১৪.৫%) এবং সামাজিক কারণ (১৪.১%)।

তৃতীয় শ্রেণীতে ঝরে যাবার হার বেশি ছিল, যেহেতু ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে পাঠ্যপুস্তকগুলো কঠিন বলে মনে হয়। এ গবেষণায় সুপারিশ করা হয় পাঠ্যপুস্তক সংশোধিত করে ছাত্রছাত্রীদের জন্য সহজতর করা। বিদ্যালয়ের দূরত্ব এবং যানবাহনের অভাবও বিদ্যালয়ে যাবার ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে। পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদ্যালয়ে যাবার উপযোগী শিশুদের জন্য এটি একটি বড় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়। মেয়ে শিশুরা পর্যাপ্ত যানবাহনের অভাবে বিদ্যালয়ে যেতে অনীহা প্রকাশ করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের ছাত্র-ছাত্রীরা যথা সময়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হবার জন্য যানবাহন খুব কম পায়। দূরবর্তী বিদ্যালয়গুলোতে যেতে ইভটিজিং-এর মতো ঘটনা ঘটে, ফলে মেয়েদের বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ার হার বৃদ্ধি পায়। বান্দরবন

ও রাঙামাটি অঞ্চলের ছাত্রীরা নিয়মিত বিদ্যালয়ে না যাবার একটি সমস্যা হিসেবে দূরত্বকে চিহ্নিত করে। পর্যাপ্ত নৌযান বা নৌকা না থাকাটাও বিদ্যালয়ে না যাবার কারণ হিসেবে দায়ী করেছে তারা। অপরদিকে ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরে বস্তি উচ্ছেদ এবং প্রতিবেশীর সঙ্গে কলহের কারণে বহু পরিবার ছেলেমেয়েসহ অন্যত্র চলে যাওয়ায় বিদ্যালয়ে যাওয়াও বন্ধ হয়ে গেছে। এসব ঘটনাও বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ার অন্যতম কারণ।

ঝরে যাওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের বর্তমান অবস্থা

ব্র্যাক প্রাথমিক বিদ্যালয় ত্যাগ করার পরে বহু ছাত্র-ছাত্রী অন্য বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। এদের বেশিরভাগই অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের চেয়ে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বেশি ভর্তি হয়। এই হার শহরাঞ্চলে ৩৫% এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে ৬৩%। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির কারণ হচ্ছে এক্ষেত্রে বেশ কিছু সুবিধা পাওয়া যায় যেমন সরকারি বৃত্তি, পর্যাপ্ত বসার জায়গা, খেলার মাঠের সুবিধা, ধর্মীয় বিষয়ে শিক্ষা প্রদান এবং ক্লাসের সময়ে নমনীয়তা।

অন্যদিকে অভিভাবকরাও আগ্রহান্বিত থাকেন ছেলে-মেয়েদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করার জন্য যাতে তারা ধর্মীয় মূল্যবোধসমূহ শিখতে পারে। ব্র্যাক প্রাথমিক বিদ্যালয় ত্যাগ করার পরে কিছু ছাত্র-ছাত্রী আবার অন্যান্য এনজিও পরিচালিত বিদ্যালয়েও ভর্তি হয়।

ব্র্যাক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা অব্যাহত রাখা ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ

ব্র্যাক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেসব ছাত্র-ছাত্রী তাদের শিক্ষাগ্রহণ অব্যাহত রেখেছে তারা কতিপয় ইতিবাচক সুবিধা লাভ করে থাকে যা তাদের ব্র্যাক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে থেকে যেতে উৎসাহিত করে। শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ এবং বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরণ প্রাপ্তি ছাত্র-ছাত্রীদের ব্র্যাক বিদ্যালয়ে পড়ালেখা চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করে। ব্র্যাক প্রাথমিক বিদ্যালয় সারা দেশব্যাপী বিস্তৃতভাবে ছড়িয়ে রয়েছে এবং প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। এই সুযোগ বিশেষভাবে সহায়তা প্রদান করে সেসব মেয়েদের, যারা দীর্ঘ পথ বেয়ে বিদ্যালয়ে যেতে পারে না বলে পূর্বে প্রাথমিক শিক্ষা পেতে বঞ্চিত ছিল। শিক্ষা চালিয়ে যাওয়া বেশিরভাগ ছাত্র-ছাত্রীরা (৫৭%) কোন ধরনের আয়মূলক কাজে যুক্ত থাকে না। তারা শুধুমাত্র

ব্র্যাক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে থাকে। এদের ১% অন্য বিদ্যালয়ে যায় ধর্ম-বিষয়ক শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য এবং অপর ১% ছাত্র-ছাত্রী বিদ্যালয় সময়ের পরে অন্য কাজ করে থাকে। তবে বহু ছাত্র-ছাত্রী বিদ্যালয় সময়ের পরে তাদের অভিভাবকদের কাজে সাহায্য করে।

গরীব খানার সদস্য হওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীদের গৃহস্থালীর কাজে সহায়তা করতে হয়। অভিভাবকদের রান্না বা কৃষি কাজে সহায়তা করতে হয় অথবা ছোট ভাই বোনদের দেখাশুনা করতে হয়।

প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ঝরে যাওয়া এবং পড়ালেখা চালিয়ে যাওয়া বাবা-মার দৃষ্টিভঙ্গি

শিক্ষা অব্যাহত রাখা ও ঝরে যাওয়া-এ উভয় খানার অভিভাবকগণ ব্র্যাক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থানের উপর গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন খানার কাছাকাছি হওয়ায় বাচ্চাদের বিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে এটি তাদের সহায়তা করে। তবে বিনামূল্যে বই, পেন্সিল এবং লেখার খাতা পাওয়ার সুবিধা সন্তানদের ব্র্যাক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে অভিভাবকদের উৎসাহিত করে। অভিভাবকরা আরো স্বীকার করেন যে, ব্র্যাক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নত পর্যায়ের।

গবেষণা থেকে জানা যায় ছাত্র-ছাত্রীদের বয়স ঝরে পড়া বা শিক্ষা চালিয়ে যাবার ক্ষেত্রে একটি প্রধান বিষয় হিসেবে কাজ করে। বেশ কিছু শিক্ষার্থী জানায় তাদের সহপাঠীদের চেয়ে বয়সের কারণে শারীরিকভাবে বেশি বৃদ্ধি পাওয়ায় বিদ্যালয়ে যেতে তারা লজ্জাবোধ করে। অভিভাবকরাও একটু বেশি বয়সের ছেলে-মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে অনিচ্ছুক থাকেন। সর্বোচ্চ ঝরে যাবার ঘটনা ঘটে শিক্ষার্থীদের ১২-১৬ বছর বয়সের মধ্যে। অভিভাবকরা আরো মনে করেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠানোর চেয়ে ১২-১৬ বছর বয়সী ছেলে-মেয়েদের খানার কাজেই নিযুক্ত করা উচিত ।

উপসংহার

বেশিরভাগ অভিভাবক আয়বর্ধনমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার বিষয়টি দেখভাল করতে পারে না। অভিভাবকদের অনাগ্রহে ছাত্র-ছাত্রীরা উৎসাহ হারিয়ে ফেলে, ফলে বহু ছাত্র-ছাত্রী বিদ্যালয় থেকে ঝরে যায়। গবেষণায় দেখা যায় অভিভাবকদের শিক্ষা তাদের বাচ্চাদের শিক্ষা অব্যাহত রাখতে বড় ভূমিকা পালন করে। কারণ এক্ষেত্রে অভিভাবকরা তাদের বাচ্চাদের বিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত বাড়ির কাজ করতে সহায়তা করতে পারে। অবশ্য বহু ঝরে যাওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের বাবা-মার অনুপস্থিতিতে তাদের ছোট ভাই-বোনের দেখাশোনা করতে হয়। এছাড়া পরিবারে নানা ধরনের কাজও করতে হয়। ফলে মেয়েদের ক্ষেত্রে বিদ্যালয় থেকে ঝরে যাবার হার বেশি থাকে। অঞ্চলগত পার্থক্যও এক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের ঝরে যাবার ওপর প্রভাব ফেলে। আয়বর্ধনমূলক কাজে জড়িয়ে যাওয়া ও যোগাযোগ সমস্যাও বিদ্যালয় থেকে ঝরে যাবার জন্য দায়ী। পার্বত্য চট্টগ্রামের ছাত্র-ছাত্রীদের ভাষাগত বিভিন্নতার কারণে ব্র্যাক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যে ভাষায় পড়ানো হয় তা হুবহু অনুসরণ করা কঠিন। ফলে শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পারস্পরিক ভাব আদান-প্রদানে সমস্যার সৃষ্টি হয়। ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচি বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর ভাষা নিয়ে কাজ শুরু করেছে। প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক দুটি বা তিনটি নৃগোষ্ঠীর ভাষায় তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য উৎস থেকে এসব ভাষায় গল্পের বইও সংগৃহীত হয়েছে।

ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচি বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর শিশুদের ব্র্যাক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা চালিয়ে যেতে বিশেষভাবে সহায়তা দিচ্ছে। এখন প্রয়োজন পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনা করা। এতে করে বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর শিশুদের বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া হ্রাস পাবে।

লেখাপড়া চালিয়ে যাবার ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের শিক্ষায় মনোযোগী হতে পারে যদি পাঠ্যপুস্তকসমূহ পূর্ববর্তী বছরের পুস্তকের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। বেশিরভাগ ছাত্র-ছাত্রী তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হবার পরে পাঠ্যপুস্তক অনুসরণে সমস্যার সম্মুখীন হয়।

সুপারিশসমূহ

ব্র্যাক প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের ঝরে পড়া রোধে নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করা যেতে পারেঃ

১. ব্র্যাক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা তৃতীয় শ্রেণীতে উঠার পরে পাঠ্যপুস্তকজনিত জটিলতায় ভোগে। পূর্ববর্তী বছরের পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে নতুন শ্রেণীর বইয়ের কোন সাদৃশ্য ছাত্র-ছাত্রীরা খুঁজে পায় না তাই তৃতীয় শ্রেণীর বই সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করা যেতে পারে এবং এসব পাঠ্যপুস্তক সহজ করা যেতে পারে।

২. পার্বত্য-চট্টগ্রামের রাঙামাটি ও বান্দরবনে ব্র্যাক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী একই নৃগোষ্ঠীর হতে হবে। অপরদিকে, বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর ছাত্র-ছাত্রীদের ভাষা প্রশিক্ষণে যে সময় দেওয়া হয় তা পর্যাপ্ত নয়। তাই এক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ বাড়াতে হবে।

৩. ছাত্র-ছাত্রীদের ঝরে যাওয়া কমাতে বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষকদের উপস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কারণ কিছু কিছু অভিভাবক তাদের সন্তানদের এমন বিদ্যালয়ে পাঠাতে আগ্রহী যেখানে শিক্ষকরা শিক্ষা প্রদানে আন্তরিক থাকেন। শিক্ষক ঝরে যাওয়াও ছাত্র-ছাত্রী ঝরে পড়ার ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। শিক্ষক ঘন ঘন বদলালে বিদ্যালয় বেশ কিছু সময়ের জন্য বন্ধ থাকে। তাই শিক্ষকদের বিদ্যালয়ে ধরে রাখার জন্য পর্যাপ্ত সম্মানী ও সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. শিক্ষার্থীদের কাছে ইংরেজি ও অংক কঠিন বিষয় বলে মনে হয়। এক্ষেত্রে তারা ভুল করলে বা বাড়ির কাজ করে আনতে না পারলে বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের দ্বারা শাস্তির সম্মুখীন হয় বা বকা খায়। ফলে নিয়মিত স্কুলে আসতে ছাত্র-ছাত্রীরা উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। এক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শিক্ষার্থীদের উৎসাহ প্রদানে সচেষ্ট হতে হবে ।

৫. ব্র্যাক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা যেমন স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা, বৈদ্যুতিক পাখা, বেঞ্চ এবং নিরাপদ পানির বন্দোবস্ত

থাকতে হবে। ঘরের ছাদ এবং দেয়াল মাঝে মাঝে মেরামত করা দরকার। তা'না হলে বৃষ্টির পানিতে শ্রেণীকক্ষের বইপুস্তক নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

৬. শ্রেণীতে ভর্তির ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের শারীরিক বৃদ্ধি ও বয়স বিবেচনায় নিতে হবে, কারণ শারীরিকভাবে বা বয়সে বড় শিক্ষার্থীরা তার চেয়ে শারীরিকভাবে বা বয়সে ছোট শিক্ষার্থীর সঙ্গে একত্রে ক্লাস করতে লজ্জা পায়।

৭. বিদ্যালয়গুলোতে বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা উচিত। এতে করে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকগণ বিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ডের প্রতি আগ্রহ বোধ করবে। অন্যদিকে শিক্ষার্থীরা যেমন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হবে তেমনি নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিচিতিও তুলে ধরতে পারবে, বিশেষত পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে।

© BRAC
নির্যাস ২০১১ আগস্ট;২২:৩৬-৪২

অতিদরিদ্র খানাসমূহে মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্যসেবা পাবার সার্বিক চিত্রঃ একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন*

নুজহাত চৌধুরী ও সৈয়দ মাসুদ আহমেদ

- গর্ভবতী অবস্থাকে মহিলারা একটি স্বাভাবিক অবস্থা হিসেবেই বিবেচনা করে এবং গর্ভবতী হয়েছে কী'না জানার জন্যই কেবলমাত্র মহিলারা মাতৃত্বপূর্ব সেবা গ্রহণ করেন এবং প্রসবের জন্য কোন পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করে না।
- অতিদরিদ্র খানাগুলোতে মাতৃত্বকালীন সেবার ক্ষেত্রে সনাতন বিশ্বাস এবং আচার-আচরণের বেশ প্রভাব রয়েছে। আর্থিক সীমাবদ্ধতার সঙ্গে যুগপৎভাবে সনাতন বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান মাতৃত্বপূর্ব জটিলতায় সেবা নিতে বিলম্ব ঘটায়।
- দরিদ্রতা সত্বেও নিজ স্ত্রীর গর্ভধারণের সময় কিছু সংখ্যক স্বামী ইতিবাচক ভূমিকা রাখে।

বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকায় এবং শহরাঞ্চলের বস্তিতে মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে বিভিন্ন গবেষণা পরিচালিত হলেও অতিদরিদ্র নারীরা এর বাইরেই রয়ে গেছে। এটা জানা দরকার যে, নারীরা কোন অবস্থায় নতুন অভ্যাস স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করে এবং এটা তাদের আচরণগত পরিবর্তন ঘটানোর জন্য প্রাসঙ্গিক কী না। ব্র্যাকের অতিদরিদ্র কর্মসূচির দ্বিতীয় পর্যায়ে কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী মহিলাদের মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের (প্রসবকালীন সময়ে, প্রসবের সময় ও প্রসব পরবর্তী) প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে এই গবেষণায় তা জানার চেষ্টা করা হয়েছে। স্বাস্থ্য শিক্ষা সম্পর্কিত বার্তা পৌঁছাতে বা এ সংক্রান্ত কর্মসূচি প্রণয়নে এ ধরনের গবেষণা সহায়ক হবে।

* 'Maternal care practices among the ultra poor households in rural Bangladesh: a qualitative exploratory study' (২০১১) শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ। সার-সংক্ষেপ করেছেন আলতামাস পাশা।

গবেষণালব্ধ ফলাফল

এই গবেষণার জন্য উপাত্ত সংগৃহীত হয় রংপুর এবং কুড়িগ্রাম জেলার গর্ভবতী মহিলাদের কাছ থেকে যাদের পূর্বে সন্তান ধারণের অভিজ্ঞতা ছিল এবং ঐ সময় শিশুকে স্তনদানকারী মায়েদের কাছ থেকে। গবেষণায় দেখা যায় যে, মহিলারা সাধারণত কোন জটিলতা না দেখা দিলে গর্ভধারণকে একটি স্বাভাবিক ঘটনা মনে করে। বেশিরভাগ মহিলা তাদের গর্ভধারণ সম্পর্কে সচেতন হন যখন তাঁদের মাসিক বন্ধ হয়ে যায়, বমি বমি ভাব এবং বমি হয়, ক্ষুধা কমে যায় এবং যখন তারা দুর্বলতা অনুভব করেন। অধিকাংশ মহিলাই গর্ভধারণের প্রথম ২-৩ মাসের মধ্যেই তা বুঝতে পারেন। গর্ভধারণ নিশ্চিত হওয়া ব্যতীত গর্ভকালীন স্বাস্থ্যসেবা নিতে তারা বিরত থাকে। এছাড়া সন্তান প্রসবে কোন পূর্ববতী প্রস্তুতিও তারা নিতে চায় না। গবেষণায় অংশগ্রহণকারী বেশিরভাগ মহিলার বয়স ছিল ২০-এর কোঠায়। খানা প্রধানরা অকৃষিখাতে শ্রম দেয় যেমন রিক্সা চালানো। বেশিরভাগই বসবাস করে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে।

প্রসবপূর্ববর্তী স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ

বিশজন মহিলার মধ্যে আটজনই নিকটবর্তী স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে যায় গর্ভধারণ হয়েছে কী'না তা পরীক্ষা করতে। প্রসব পূর্ববর্তী যে সাধারণ সেবা বেশিরভাগ মহিলা গ্রহণ করে তা হচ্ছে আয়রন ট্যাবলেট খাওয়া। অবশ্য মহিলারা সবগুলো আয়রন ট্যাবলেট গ্রহণ করেন না। কারণ হিসেবে তারা জানান, এসব ট্যাবলেট স্বাদহীন বা কটু স্বাদযুক্ত এবং এগুলো খেলে পায়খানার রং কালো হয়। নিজেদের সর্বশেষ গর্ভধারণের সময় কেউই দু'মাসের বেশি আয়রন ট্যাবলেট গ্রহণ করেন নি। তাঁদের অধিকাংশই মনে করেন প্রসবপূর্ববর্তী স্বাস্থ্য সেবা তাদের অথবা শিশুর জন্য তেমন কোন ইতিবাচক ফল বয়ে আনে না। এই সেবা না নেবার অন্যান্য কারণ হচ্ছে আর্থিক সীমাবদ্ধতা, যথাযথ জ্ঞানের অভাব বা অসচেতনতা এবং মহিলাদের খানার বাইরে যেতে না পারা।

সামাজিক বাধা

অতিদরিদ্র মহিলারা সামাজিক বাধার কারণে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে অপারগ থাকে। তাঁরা মনে করেন তাঁদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার কারণে স্বাস্থ্যকর্মীরা তাঁদের সঙ্গে

ভালো ব্যবহার করে না। বাচ্চাকে স্তন্যদানকারী একজন মহিলা জানান, তিনি স্বাস্থ্যকর্মীকে এড়িয়ে চলছেন কারণ সে যদি তাঁর চতুর্থ গর্ভধারণ সম্পর্কে জানতে পারে তা হলে তাকে গালমন্দ করবে। উক্ত স্বাস্থ্যকর্মী তাকে জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি খেতে দিয়েছিল। স্বাস্থ্যকর্মীদের খারাপ ব্যবহার, কটূক্তি এবং ধৈর্য্যের অভাব মহিলাদের প্রসবপূর্ববর্তী সেবা গ্রহণে নিরুৎসাহিত করে।

গর্ভকালীন পুষ্টি অবস্থা

মহিলারা জানান যে, গর্ভকালীন সময়ে নির্দিষ্ট খাবার গ্রহণে অনীহার কারণেই মূলত তাদের খাবার গ্রহণের পরিমাণ কমে যায়। আর্থিক অস্বচ্ছলতা হচ্ছে এর আরেকটি অন্যতম কারণ। অতিদরিদ্র খানাসমূহ সাধারণত নির্দিষ্ট খাদ্য হিসেবে চাল, আলু এবং ছোটমাছ কেনাকেই বুঝিয়ে থাকে। অবশ্য স্বল্প সংখ্যক মহিলা জানান যে, গর্ভধারণের সময়ে তারা বেশি খাদ্য গ্রহণ করেন। নির্দিষ্ট খাদ্যের মধ্যে গুড়ের শরবত, মরিচ দিয়ে ভাত এবং দুধের কথা উল্লেখ করেছেন মহিলারা। দু'জন মহিলা উল্লেখ করেছেন যে, মা অথবা শিশুর সুস্বাস্থ্যের জন্য খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ বাড়ানো দরকার। যে সকল পরিবারে স্বামী এবং অন্যান্য সদস্যরা গর্ভাবস্থায় মহিলাদের কী প্রয়োজন তা জানে সেখানে গর্ভবতী মহিলাদের অবস্থা ভাল দেখা গেছে। অপরপক্ষে কিছু খাদ্য যেমন, হাঁস, কবুতর, গরু এবং ইলিশ মাছ 'গরম' খাদ্য হিসেবে মনে করা হয় এবং গর্ভধারণের সময় তা খেতে নিরুৎসাহিত করা হয়। আবার কিছু কিছু মাছ যেমন টাকি, চান্দা এবং পুঁটি মাছ - যা ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে থাকে - গর্ভধারণের কারণে তাও খেতে মানা করা হয়। তবে অতিদরিদ্র খানাসমূহে ফল খাবার ক্ষেত্রে কোন বিধি-নিষেধ নেই।

গর্ভধারণের সময় মহিলাদের চলাফেরায় বিধিনিষেধ আরোপ

অতিদরিদ্র খানাসমূহে একটি সাধারণ বিশ্বাস রয়েছে যে, অশুভ আত্মার প্রভাব বেশি সক্রিয় থাকে সন্ধ্যা, দুপুর এবং রাতে। তাই ঐ সময়ে গর্ভবতী মহিলারা ঘরের বাইরে যেতে চায় না। গর্ভবতী মহিলাদের কবরস্থানের কাছ দিয়ে যাওয়াও ক্ষতিকর বলে মনে করা হয়। যদি একান্ত যেতেই হয় তখন তারা চুল বেঁধে মাথায় কাপড় দিয়ে কবরস্থান অতিক্রম করে। বেশিরভাগ মহিলা উল্লেখ করেন যে, চন্দ্রগ্রহণ এবং সূর্যগ্রহণ গর্ভবতীর স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এ সময় তারা বাসার

ভিতরে থাকে এবং হাঁটাহাঁটি করে, কিন্তু কোন অবস্থাতেই বিছানায় শুয়ে থাকে না। এসময় তারা খাওয়া-দাওয়া বা রান্না বন্ধ রাখে। যে কোন অবস্থাতে পরিবারের বয়স্ক মহিলারাই গর্ভবতী মহিলাদের চলাফেরায় বিধিনিষেধ আরোপ করেন, স্বাস্থ্য কর্মীরা কখনই কোন প্রকার বিধিনিষেধ আরোপ করে না।

স্বামীর সহযোগিতা

দেখা গেছে দরিদ্রতার মধ্যেও নিজ স্ত্রীর গর্ভধারণের সময় কিছু সংখ্যক স্বামী ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে। গর্ভবতী অবস্থায় তাদের স্ত্রীদের চরম প্রতিকূলতার মধ্যেও গৃহস্থালীর কোন কাজ করতে দেয় নি। স্বামীদের এ ধরনের মনোভাবকে মহিলারা স্বাগত জানিয়েছেন। কারণ তাঁরা গর্ভবতী অবস্থায় গৃহস্থালীর সাধারণ কাজকর্ম করতে খুব দুর্বলবোধ করতো। তিনটি ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, মহিলারা তাঁদের স্বামীদের সঙ্গে আলাপ করে যৌথভাবে সিদ্ধান্ত নেন তাদের বাচ্চাদের বিদ্যালয়ে যাওয়া আপাতত বন্ধ রেখে গৃহপালিত পশু দেখভাল করাবেন, যাতে উক্ত মহিলারা গর্ভধাণের সময় কিছুটা বিশ্রাম পান। সার্বিকভাবে দেখা যায় যে গর্ভধারণের সময় মহিলারা ভারি কাজের ক্ষেত্রে তাদের স্বামী এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সহায়তা লাভ করেন। ভারি কাজ বলতে মহিলারা বুঝে থাকেন পানি তুলে আনা, শস্য শুকানো, রান্নার ভারি হাঁড়ি চুলায় উঠানো-নামানো এবং পশুখাদ্য তৈরি করা।

প্রসব পূর্ব প্রস্তুতি

প্রসব পূর্ব প্রস্তুতির মধ্যে ছিল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দাই নির্বাচন, নিরাপদ প্রসবের জন্য ডেলিভারি কিট-এর ব্যবস্থা করা, জরুরি অবস্থায় কোথায় যেতে হবে তা নির্ধারণ করা এবং প্রয়োজনীয় টাকা ও যানবাহন ঠিক করে রাখা। গবেষণায় একজন মাত্র মহিলার প্রসবপূর্ব প্রস্তুতি পরিকল্পনা পাওয়া গেছে। বেশিরভাগ মহিলাই পূর্ব থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রীদের সাথে যোগাযোগ করে না। তাদের ধারণা আগে থেকে ধাত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তারা জাদুটোনা করবে। এতে প্রসবকালীন জটিলতা দেখা দেবে এবং প্রসব-সংক্রান্ত খরচও বৃদ্ধি পাবে।

গর্ভকালীন সেবা

প্রসব ব্যথা উঠার পরে বয়স্ক মহিলারা সাধারণত ব্যাপারটি তাদের নিজের হাতে নিয়ে নেয় এবং এবং নির্দিষ্ট কতিপয় আচার পালন করে যাতে বাচ্চা প্রসব তাড়াতাড়ি হয়। মহিলাদের আত্মীয়স্বজন মাঝে মাঝে তাদের পানি পড়া খেতে দেয়। এতে করে মানসিকভাবে মহিলারা সাহস সঞ্চয় করে যাতে প্রসবকালীন ব্যথা সহ্য করতে পারে। দেখা গেছে বেশিরভাগ প্রসবই বাসায় হয়ে থাকে - বিশটির মধ্যে উনিশটি বাসায় হয়ে থাকে। প্রচণ্ড প্রসব ব্যথা শুরু হবার পরেই সাধারণত প্রশিক্ষিত ধাত্রী ডাকা হয়। প্রসবের সময় প্রশিক্ষিত ধাত্রী বা বন্ধুবান্ধব/আত্মীয়স্বজন সাধারণত উপস্থিত থাকে। প্রায় সব প্রসবই মেঝেতে হয়ে থাকে। চারজন মহিলা খালি মেঝেতে বাচ্চা প্রসব করেছেন। বাদবাকীরা মেঝেতে কাপড় বা চটের বস্তা বা খড়ের উপর প্রসব করেন। বিছানা নষ্ট হবে এই ভাবনা থেকে বিছানায় প্রসব হয় নি। মহিলাদের মতে মেঝেতে পলিথিন বা খড় বিছানো থাকলে রক্ত এবং গর্ভফুল পরিষ্কার সহজতর হয়। প্রসব করানোর সময় ধাত্রীদের সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার হার খুব কম। নাড়ী কাটার জন্য ব্লেড গরম পানিতে ফোঁটানোর হার বেশি হলেও সেলাই করার সুতা ধাত্রীরা ফুটিয়ে নেয় না।

প্রসব পরবর্তী সময়েও মহিলদের খাদ্যগ্রহণে কিছু বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়। প্রথম ৫-৯ দিন এসব নিষেধ মানতে বাধ্য করায় মহিলারা যথাযথ পুষ্টি পায় না। স্তন্যদানের সময় অতিদরিদ্র খানাসমূহে যেসব খাদ্য পাওয়া যায় তা যথাযথ নয় বলে মনে করা হয়। গবেষণায় দেখা যায় চারজন মহিলাকে প্রসবের প্রথম কয়েকদিন কোন খাদ্যগ্রহণ থেকে বিরত রাখা হয়। এছাড়া সাধারণভাবে প্রসবের পরে প্রথমদিন কোন খাদ্য খেতে দেওয়া হয় না যাতে মায়ের ক্ষত শুকাতে পারে। এছাড়াও এ সময়টিতে মেয়েদের অপবিত্র ভাবা হয়। আর এ কারণে কোন খাদ্যবস্তু তাদের স্পর্শ করতে দেওয়া হয় না। পরিবারের অন্যান্য সদস্যের জন্য খাবার বানানোর জন্যেও তাদের নিষেধ করা হয়। গবেষণায় আরো দেখা যায় যে, সদ্য মা হওয়া মহিলাটি কী খাবে না খাবে তা নির্ধারণে প্রধান ভূমিকা পালন করে শাশুড়ি এবং পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিরা।

প্রসব পরবর্তী সময়ে সাধারণত যেসব খাবার খাওয়া হয় তার মধ্যে রয়েছে মরিচ মাখানো ভাত, আলু ভর্তা, লাল চা, কাঁচা কলা, জিরা, ইত্যাদি। মনে করা হয়

এসব খাবার মায়ের পেট ঠাণ্ডা রাখবে এবং স্তনে দুধ উৎপাদন বাড়াবে। প্রসব পরবর্তী সময়ে যে বিশেষ খাবার খাওয়ানোই হউক না কেন তা খুব কম সময়ের জন্য দেওয়া হয়, বিধি-নিষেধ দীর্ঘ সময় ধরে চলে। প্রায় ২১-৪০ দিন পর্যন্ত এটা স্থায়ী হয়। মায়েদের মশলাযুক্ত খাবার খেতে দেওয়ার বিষয়ে মিশ্র মনোভাব দেখা গেছে। প্রথম কয়েকদিন ক্ষত শুকানোর জন্য এসব খাবার দেওয়া হলেও পরবর্তীতে তা বন্ধ করে দেওয়া হয় বুক জ্বালা করবে এমন অজুহাতে।

মহিলারা জানান যে, তাদের শেষ গর্ভধারণের সময়ও প্রসবের পরে তারা দেহে ভয়ানক ব্যথাসহ দুর্বলতা অনুভব করেছিলেন। এ অবস্থা এক থেকে তিন সপ্তাহ পর্যন্ত স্থায়ী হয়। তবে তাদের কেউই কোন স্বাস্থ্যকর্মীর কাছে এ সমস্যা নিয়ে যান নি এবং কোন সেবাও গ্রহণ করেন নি।

জনমিতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ, প্রাচুর্যের অভাব এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থাসমূহ মাতৃত্বকালীন সেবার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অতি দরিদ্রতা ও সামাজিক বাধা এমন পরিবেশ সৃষ্টি করে যা মহিলাদের প্রসবপূর্ববর্তী ও পরবর্তী সেবা গ্রহণ করা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে।

দেখা গেছে, একজনমাত্র স্বাস্থ্যকর্মী একের অধিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করায় কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয়। যেহেতু একই ব্যক্তি জন্মনিরোধক পিল বিতরণ করে এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সচেতন করার পাশাপশি মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্যসেবাও প্রদান করে, সেহেতু অনেক মহিলা তাদের কাছে গর্ভকালীন সমস্যা সম্পর্কে বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না। যদি স্বাস্থ্যকর্মী গালাগালি করে সেই চিন্তা থেকে আবার গর্ভবতী হবার খবর বলতে ভয় পায়। তাই স্বাস্থ্যকর্মীদের এক্ষেত্রে আরো সচেতন, মনোযোগী ও সহানুভূতিশীল হতে হবে, যাতে অতিদরিদ্র নারীরা তাদের গর্ভকালীন অবস্থা এবং সংশ্লিষ্ট সমস্যা নিয়ে স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে স্বাচ্ছন্দে আলাপ করতে পারে।

উপসংহার

এই গবেষণা থেকে জানা যায় যে, অতিদরিদ্র খানাগুলোর মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে সনাতন বিশ্বাস এবং নিয়ম-নীতির যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। সহায়তা

কার্যক্রমের মাধ্যমে সুবিধাভোগীর অর্থনৈতিক জীবনে যে প্রভাব পড়ে তাও সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিশ্বাস ও নিয়ম-কানুন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ায় সামাজিকভাবে এক্ষেত্রে সমঝোতায় আসতে হয় যা সময়ের প্রেক্ষিতে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে। এই সহায়ক কার্যক্রম স্বাস্থ্য আচরণ সম্পর্কিত শিক্ষায় খুব সতর্কতার সঙ্গে স্থানীয় সামাজিক বিশ্বাস সমূহকে অঙ্গীভূত করতে পারে যেন ভিন্ন সাজে সুষ্ঠুভাবে মাতৃত্বকালীন সেবা প্রদান করা যায়। আরেকটি গবেষণা করা যেতে পারে যার মাধ্যমে সঠিকভাবে জানা যাবে অতিদরিদ্র মহিলারা অন্যান্য শ্রেণীর মহিলাদের তুলনায় কী মাত্রায় ও পরিমাণে অসুবিধাজনক অবস্থার সম্মুখীন হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থার ওপর একটি পর্যবেক্ষণ*

দেবাশীষ কুমার কুণ্ডু, মৃন্ময় সমদ্দার, আশ্রাফুজ্জামান খান ও শাহরীন শাজাহান নাওমী

- এই গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর অনানুষ্ঠানিক ও আনুষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থায় ব্র্যাক এর হিউম্যান রাইটস এন্ড লিগ্যাল সার্ভিসেস কর্মসূচির কার্যকর সহায়তা প্রদানের সম্ভাব্যতা যাচাই করা।
- প্রথাগত বিবাদ মীমাংসা পদ্ধতি পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর মধ্যে জনপ্রিয় হলেও তা সর্বক্ষেত্রে মানবাধিকার সংরক্ষণে সমর্থ নয়।
- পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর মানুষ আনুষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থা ও আইন সম্পর্কে কম জানে। এক্ষেত্রে তাদের সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তির সুযোগও কম।

পার্বত্য চট্টগ্রামের রয়েছে নিজস্ব একটি বিচার ব্যবস্থা। লোকাচার ও সংস্কৃতিগত ভিন্নতার কারণে এখানে আলাদা বিচার ব্যবস্থা বহুদিন থেকেই বিদ্যমান রয়েছে। বলা যায় পার্বত্য চট্টগ্রামে একই সঙ্গে দুটি বিচার ব্যবস্থা বিরাজ করছে। একটি বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় বিচার ব্যবস্থা আর অন্যটি হচ্ছে এখানকার আদিবাসীদের বিবাদ মীমাংসার ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতি যা আদিবাসীদের প্রথাগত আইনের ওপর নির্ভরশীল।

রুলস ফর টেরিটরিয়াল সার্কেল ইন চিটাগং হিল ট্র্যাক্টস ১৮৮৪ (১৮৯২ সালে সংশোধিত) এই এলাকাকে তিনটি সার্কেলে বিভক্ত করে- চাকমা সার্কেল, বোমাং

* 'State of justice in Chittagong hill tracts: exploring the formal and informal justice institutions of indigenous communities' (২০১০) শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ। সার-সংক্ষেপ করেছেন আলতামাস পাশা ও মৃন্ময় সমদ্দার।

সার্কেল এবং মং সার্কেল। প্রতিটি সার্কেল শাসিত হত এক স্থানীয় প্রধানের মাধ্যমে। এই প্রধানের দায়িত্ব ছিল রাজস্ব আদায় ও অভ্যন্তরীণ বিষয়ের দেখভাল করা। প্রতিটি সার্কেল পরবর্তীতে 'তালুকে' বিভক্ত হয় যা শাসিত হত 'দেওয়ান'দের দ্বারা। এসব তালুক আবার উপবিভক্ত হয় 'মৌজা'-সার্কেলে এবং শাসিত হয় হেডম্যান দ্বারা। প্রতিটি মৌজা বিভক্ত হয় গ্রাম বা পাড়ায়। এগুলো শাসিত হয় হেডম্যানের অধীনে থাকা কারবারিদের মাধ্যমে।

সম্প্রতি পার্বত্য এলাকার আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থার উপর একটি পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণা পরিচালনা করা হয়। গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর অনানুষ্ঠানিক ও আনুষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থায় ব্র্যাকের হিউম্যান রাইটস এন্ড লিগ্যাল সার্ভিসেস (এইচআরএলএস) কর্মসূচির কার্যকর সহায়তা প্রদানের সম্ভাব্যতা যাচাই করা।

এ গবেষণাটি পরিচালিত হয় চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, ম্রো এবং বাঙালি জনগোষ্ঠীর ৬০১ জন সদস্যের ওপর যাদের নির্বাচন করা হয় ২৪টি পাড়া বা গ্রাম থেকে। প্রাথমিকভাবে গবেষণায় তিন ধরনের পাড়া নির্বাচন করা হয় আদিবাসীদের অবস্থানের ভিত্তিতে। এগুলো হচ্ছে-

ক) সম্পূর্ণভাবে পাহাড়ি বিভিন্ন নৃগোষ্ঠী অধ্যুষিত; খ) বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর সংমিশ্রণ; গ) বিভিন্ন নৃগোষ্ঠী -বাঙালি অধ্যুষিত। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে জরিপ, কেস স্টাডি, অনানুষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং অনানুষ্ঠানিক আলোচনার সহায়তা নেওয়া হয়েছে।

গবেষণালব্ধ ফলাফল

আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থার সহায়তা নেওয়া নির্ভর করে সমস্যার স্বরূপ এবং এর সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষের সংশ্লিষ্টতার ওপর। অবশ্য বেশিরভাগ সমস্যা বা মামলা অনানুষ্ঠানিক বিচার দ্বারা মীমাংসিত হয়, কারণ এক্ষেত্রে সময় ও অর্থ দুটোই কম লাগে। সাধারণত যেসব সমস্যার মীমাংসা করতে হয় সেগুলো হচ্ছে মারামারি, চুরি, ভূমি দস্যুতা ও খানার অভ্যন্তরীণ বিবিধ সমস্যা, ঝগড়া বিবাদ ইত্যাদি। এমনকি এক্ষেত্রে ধর্ষণসহ খুনের ঘটনাও অন্তর্ভুক্ত

থাকে। আশ্চর্যজনকভাবে দেখা যায় যে, সম্পূর্ণভাবে বিভিন্ন নৃগোষ্ঠী অধ্যুষিত গ্রামে অপরাধমূলক ফৌজদারী বা দেওয়ানী মামলাও কারবারি এবং হেডম্যান দ্বারা মীমাংসিত হয়, আনুষ্ঠানিক সরকারি আইনের দ্বারস্থ তারা হতে চায় না। অনানুষ্ঠানিক আইন অকার্যকর হয়ে পড়ে বাঙালি এবং বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীদের মধ্যে কোন অপরাধমূলক ঘটনা বা ভূমিগত সমস্যায়। দেখা গেছে সালিশ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় সরকার সংস্থা এবং সেনাবাহিনী জড়িত হয়ে পড়ে। পার্বত্য চট্টগ্রামে অনানুষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত হতে আদিবাসীদের বিভিন্ন পর্যায়ে নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়। এসব প্রতিকূলতা ও সমস্যা চরম আকার ধারণ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভৌগলিক প্রকৃতি, রাজনৈতিক ইতিহাস, পৃথক বিচার ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন নৃগোষ্ঠী হিসেবে স্বতন্ত্র পরিচিতির কারণে।

বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক বা প্রচলিত বিচার ব্যবস্থায় দেশের অন্যান্য অংশে মানুষকে যেসব দুর্ভোগ পোহাতে হয় পার্বত্য চট্টগ্রামেও তার ব্যতিক্রম হয় না। বরং বিচারের দীর্ঘসূত্রিতা, দুর্নীতি, বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীগুলোর নিজস্ব ভাষাগত ভিন্নতা ইত্যাদির সঙ্গে আরো যুক্ত হয় যোগাযোগ ব্যবস্থার সমস্যা। যানবাহনগত দুর্ভোগের কারণে মামলার সাক্ষীরা আদালতে উপস্থিত হতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। গবেষণায় দেখা যায় বাঙালি মেয়েদের তুলনায় চাকমা, মারমা, ম্রো এবং ত্রিপুরা আদিবাসী গোষ্ঠীর মেয়েরা সালিশে অংশ নিতে বেশি স্বাধীনতা ভোগ করে। বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর মেয়েরা সালিশের মাধ্যমে ব্যাপক সুযোগ পায় তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায়। সালিশে তারা কথা বলতে পারে এবং বিচারে অন্যায় আচরণের প্রতিবাদও তারা করতে পারে।

বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর নারীরা কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব এবং ভয়-ভীতি ছাড়াই সালিশে অংশ নিতে পারে, কিন্তু তারা যথাযথভাবে তাদের কথা তুলে ধরতে পারে না। বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর কারবারি বা হেডম্যানের মধ্যে কোন মেয়ে সদস্য দেখা যায় নি। ফলে, অনানুষ্ঠানিক বিচারে পুরুষ বিচারক থাকায় একজন নারীর দুঃখ-কষ্ট পুরুষ কারবারি বা হেডম্যানের পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না। প্রথাগত বিচার ব্যবস্থায় পুরুষতান্ত্রিক ধারা ভুক্তভোগী নারীর প্রতিবাদে সোচ্চার হবার পথকে সীমিত করে দেয়। এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামে নারীদের অধিকার রক্ষায় কোন নির্দিষ্ট প্রথাগত আইন নেই।

গবেষণায় দেখা যায় এক্ষেত্রে বিভিন্ন অমানবিক ধরনের শাস্তি প্রদান করা হয় পার্বত্য চট্টগ্রামের অনানুষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থায়। এসব শাস্তির মধ্যে রয়েছে চুল কেটে দেওয়া, জুতার মালা পরানো, শুকরের সঙ্গে রাখা ইত্যাদি। বেশিরভাগ বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর মানুষেরই আনুষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান খুব কম। কারবারি এবং হেডম্যানদেরও একই অবস্থা, সেই সঙ্গে মানবাধিকার এবং ন্যায় বিচার সম্পর্কেও তাদের কোন ধরণা নেই।

প্রাথমিকভাবে এসব কারবারি ও হেডম্যান বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর মানুষকে সম্ভাব্য বিচার-আচার দিয়ে থাকে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এসব প্রথাগত বিচার ব্যবস্থা ধনী ও রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী ব্যক্তিগণের দ্বারা ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হওয়ায় বিচার ন্যায্যতা হারায়।

সুপারিশসমূহ

ব্র্যাকের এইচআরএলএস কর্মসূচি পার্বত্য চট্টগ্রামে বিস্তৃত করার সময় উক্ত কর্মসূচিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বঞ্চনার ঐতিহাসিক বিভিন্ন কারণ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনকে বিবেচনায় রাখতে হবে। বিভিন্ন মানুষ পার্বত্য এলাকায় আইনী সহায়তা কার্যক্রম চালুর পক্ষপাতি। একই সঙ্গে পাহাড়ি জনগণ তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বা স্বাতন্ত্র্যের অংশ হিসেবে নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী আইনকেও সমুন্নত রাখতে চায়। তাই এইচআরএলএস কর্মসূচির উচিত হবে আইনী সহায়তা কার্যক্রম চালুর আগে এখানকার সার্কেল প্রধান, কারবারি এবং হেডম্যানদের এডভোক্যাসির আওতায় নিয়ে আসা, আদিবাসীদের এইচআরএলএস কর্মসূচি সম্পর্কে প্রচারণার আওতায় আনা। এছাড়া কর্মসূচি তাদের কার্যক্রম শুরু করতে পারে হেডম্যান এবং কারবারি বা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের মাধ্যমে এবং আস্তে আস্তে ক্ষুদ্র পর্যায়ে কার্যক্রম ছড়িয়ে দিতে পারে।

এক্ষেত্রে প্রয়োজন হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী বিবাদ নিষ্পত্তি কার্যক্রমকে শক্তিশালী করতে প্রথাগত আইনসমূহকে বিধিবদ্ধ ও পর্যালোচনা করা। এইচআরএলএস কর্মসূচিতে ঐতিহ্যবাহী সালিসকারের অন্তর্ভুক্তি এবং মানবাধিকার সম্পর্কে প্রচারণার জন্য প্রতিটি পাড়ায় দল গঠন করা যেতে পারে। এভাবে মানবাধিকার সংরক্ষণ এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হবে। মহিলারা যাতে

ঐতিহ্যবাহী বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থায় কার্যকরভাবে অংশ নিতে পারে কর্মসূচিকে তা নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে এইচআরএলএস এর প্রতিনিধি উপস্থিত থাকবেন মনিটর হিসেবে এবং তিনিও এই বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থাপকের কাজ করবেন। এছাড়া বিরোধ নিষ্পত্তিতে আঞ্চলিক ও পার্বত্য কাউন্সিল এবং ভূমি কমিশনকে কার্যকরভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

© BRAC
নির্যাস ২০১১ আগস্ট;২২:৪৮-৫১

গ্রামীণ বাংলাদেশে নারী-পুরুষ বৈষম্য এবং নারীর প্রতি সহিংসতার স্বরূপ নিরূপণ*

মো. আব্দুল আলীম

- মেয়ে শিশুদের উচ্চ শিক্ষা দিতে অভিভাবকদের অনীহা দেখা গেছে।
- পুরুষরাই চিকিৎসার ক্ষেত্রে, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে এবং পারিবারিক সম্পদ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এককভাবে সিদ্ধান্ত নেয়।
- সহিংসতার মাত্রা বেশি পাওয়া যায় নিরক্ষর মানুষ, মুসলিম জনগোষ্ঠী এবং বেকারদের মধ্যে।

সূচনা

নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্যমূলক আচরণ এবং নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ বাধা হিসেবে বিবেচিত হয়। এসব আচরণ দরিদ্র মানুষকে কর্মক্ষেত্রে পিছিয়ে দেয়। তাদের সার্বিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে। বিশেষত মহিলাদের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক অধিকার এবং মানবাধিকার হুমকির সম্মুখীন হয়। জেন্ডারগত সমতা আনার প্রেক্ষাপটে জেন্ডারগত বৈষম্য দূরীভূত করে এবং নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে ব্র্যাকের জেন্ডার কোয়ালিটি অ্যাকশন লার্নিং (জিকিউএএল) কর্মসূচি গ্রাম পর্যায়ে বাংলাদেশের ১০টি জেলায় কাজ করছে। এই ১০টি জেলার ৫০টি ব্র্যাক এরিয়া বা শাখা অফিসের ১০০টি স্থানে এই গবেষণাটি পরিচালিত হয়। এখানে জিকিউএএল কর্মসূচি গ্রামের মানুষকে নারী-পুরুষের সম্পর্কের স্বরূপ কেমন হওয়া উচিত তার উপর প্রশিক্ষণ দেয়।

* 'Understanding the dimensions of gender discrimination and violence against women in rural Bangladesh' (২০১০) শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ। সার-সংক্ষেপ করেছেন আলতামাস পাশা।

প্রতিটি শাখা অফিসে চারটি স্থান নির্ধারণ করা হয় - দু'টি ইন্টারভেনশন এবং দু'টি কন্ট্রোল। ইন্টারভেনশন স্থানের ২৬,৪৯৬টি খানার মানুষের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল।

এই গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল জেন্ডারগত পার্থক্যের বর্তমান অবস্থা জানা। অর্থাৎ খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে, চিকিৎসায়, শিক্ষায় এবং খানায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী-পুরুষে কি ধরনের বৈষম্যতা দেখা যায় তা বোঝার চেষ্টা করা হয়। অন্যদিকে নারীর প্রতি মানসিক, অর্থনৈতিক এবং শারীরিক সহিংসতার স্বরূপও জানার চেষ্টা করা হয়। এর উপর ভিত্তি করে ব্র্যাকের জিকিউএএল কর্মসূচির কার্যক্রম মূল্যায়ন করা হয়। আমাদের সমাজে প্রচলিত ধারণা আছে যে, শুধুমাত্র মেয়েরাই গৃহস্থালীর কাজকর্ম করবে এবং পুরুষরা ঘরের বাইরের যাবতীয় কাজকর্ম সমাধা করবে। গবেষণায় দেখা যায় যে, পুরুষ-নারী নির্বিশেষ প্রায় সকল অংশগ্রহণকারী মনে করেন যেসব কাজে ঘরের বাইরে যাওয়া প্রয়োজন সেসব কাজ এবং পরিবারের সদস্যদের দেখভাল পুরুষদেরই করা উচিত। আর গৃহস্থালীর কাজকর্মকে একান্তভাবেই মহিলাদের কাজ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। গবেষণায় যখন স্বামী এবং স্ত্রীর একদিনের কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল তখনও এই দৃষ্টিভঙ্গির মিল পাওয়া গিয়েছিল।

ছেলে-মেয়ের শিক্ষা সম্পর্কে বলতে গিয়ে অভিভাবকরা বিভিন্ন উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথা বলেছেন। সন্তানদের বিদ্যালয়ে ভর্তির শুরুতে বেশিরভাগ অভিভাবক তাদের মেয়ে সন্তানটিকে ছেলে সন্তানের তুলনায় বিদ্যালয়ে পাঠাতে বেশি আশাবাদী থাকেন। কিন্তু শিক্ষার উচ্চস্তরে আস্তে আস্তে এই হার কমতে থাকে।

প্রায় ১৪% অভিভাবক তাদের ছেলে সন্তান নিয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথা বলেছেন, সে তুলনায় ৭% মেয়ে সন্তান তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত যেতে সক্ষম হয়। সন্তানদের ভবিষ্যৎ পেশা সম্পর্কেও অভিভাবকদের আকাঙ্ক্ষায় পার্থক্য দেখা গেছে। বেশিরভাগ অভিভাবক (৫২%) তাদের মেয়ে সন্তানকে ডাক্তার/নার্স হিসেবে ভবিষ্যতে দেখতে চেয়েছেন। ছেলে সন্তানের ক্ষেত্রে এই হার ছিল ১৬%। এছাড়া ছেলে সন্তানের তুলনায় মেয়ে সন্তান ব্যক্তিগত শিক্ষকের সুবিধা কম পেয়েছে।

পরিবারের অর্ধেকেরও বেশি সদস্য জানান তাদের জ্বর সবচেয়ে বেশি হয় এবং ১০% ডায়রিয়া আক্রান্ত হন। গবেষণায় এ দুটি রোগের চিকিৎসায় গৃহীত ব্যবস্থায় পার্থক্য দেখা গেছে। তুলনামূলকভাবে মহিলাদের ব্যাপক অংশ (১১%) তাদের অসুখের জন্য কোন চিকিৎসা নেন না। একইভাবে তাদের একটা বিশাল অংশ চিকিৎসা নিতে কম খরচের ও তেমন দক্ষতাসম্পন্ন নয় এমন ব্যবস্থার দ্বারস্থ হয়ে থাকেন। এরা ওষুধের ফার্মেসী, হোমিও চিকিৎসক এবং ঝাঁড়ফুকের সহায়তা গ্রহণ করেন। এছাড়া মহিলাদের অসুস্থতার সময় যত দীর্ঘায়িত হয়, বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের হার তত কমে আসে।

গবেষণায় দেখা যায় দুপুরের খাবারে পরিবারের পুরুষ সদস্য সাধারণত মহিলা সদস্যের চেয়ে বেশি পরিমাণ শর্করা জাতীয় খাবার ও প্রাণীজ আমিষ গ্রহণ করে। অন্যদিকে, অধিক সংখ্যক মহিলা সদস্য পুরুষদের চেয়ে বেশি ডাল এবং শাক-সবজি খেয়ে থাকে।

গবেষণায় দেখা যায় গৃহস্থালীর নির্বাচিত সম্পদ ক্রয় এবং বিক্রয়ে খানার পুরুষরা সিদ্ধান্ত নেন এককভাবে। অল্প সংখ্যক স্ত্রী জমি ক্রয় (১৩%) এবং বিক্রয়ে (৬%) সিদ্ধান্ত দিতে পেরেছিলেন। তবে যথেষ্ট সংখ্যায় স্ত্রীরা (৮২%) অ্যালুমিনিয়ামের পাত্র বিক্রয়ে সিদ্ধান্ত দিতে পেরেছেন।

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যাদি থেকে দেখা যায় যে, উক্ত এলাকায় সহিংসতা মূলত হয়ে থাকে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে। তবে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা এক্ষেত্রে ঘটনার শিকার হয় বা ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকে। মানসিক, অর্থনৈতিক এবং শারীরিক সহিংসতা ছাড়াও অশ্লীল গালাগালি করা, রক্ত চক্ষু দেখানো এবং গায়ে হাত তোলা ইত্যাদি ঘটনা পরিবারে প্রায়শই ঘটে থাকে। বিভিন্ন ধরনের সহিংসতার প্রধান শিকার হন স্ত্রীরা। শতকারা নব্বই জন স্ত্রী জানায় তাদের অসুস্থতার সময় তাদের কটূক্তি শুনতে হয় এবং স্বামীরা অশ্লীল ভাষাও ব্যবহার করে থাকে। স্বামীর রক্তচক্ষুও তাদের দেখতে হয়। ঘরে আবদ্ধ অবস্থায় থাকতে হয়, তালাকের ভয়ে সদা আতংকিত থাকতে হয়, স্বামীরা তাদের আয় জোর-জবরদস্তি করে নিয়ে যায় এবং প্রহার করে। অন্যান্য ধরনের সহিংসতা উৎসাহিত করার জন্য প্রায় ২% স্ত্রী দায়ী থাকেন। স্বামীরাও সহিংসতার শিকার হন এবং এক্ষেত্রে পরিবারের বাইরের মানুষরাও অপরাধ করার জন্য দায়ী থাকে।

গরিব পরিবার বা খানাসমূহে সহিংসতার উপস্থিতি বেশি। তবে এনজিও সদস্য খানাসমূহে এবং যেসব মানুষ আয়বর্ধক কাজের সঙ্গে যুক্ত তাদের মধ্যে সহিংসতার হার কম। বিবাহের সঙ্গে সহিংসতার সম্পর্কও পাওয়া গেছে। এক্ষেত্রে ৬০% পুরুষ ও ২১% নারী বিবাহের আইনী বয়সের আগেই বিবাহ করে।

নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্যমূলক আচরণ এবং নারীর প্রতি সহিংসতা সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে। বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বিভিন্ন বিষয় এ ধরনের উচ্ছৃঙ্খল বা বিকৃত আচরণের জন্য দায়ী। সমাজে পুরুষদের নারীর প্রতি এ ধরনের বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ দূর করতে এবং নারীর আচরণেও পরিবর্তন আনতে হলে প্রথমত সৃষ্টি করতে হবে সচেতনতার। দ্বিতীয়ত, সমাজে মহিলাদের জন্য কাজের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে যাতে সামাজিক ও জেন্ডার বৈষম্য এবং সহিংসতা বন্ধ করা যায়। তৃতীয়ত, যে কোন ধরনের সহিংসতা দূর করতে বিদ্যমান আইনসমূহের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারি সহায়তা এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কার্যক্রম শক্তিশালী করতে ব্র্যাকের অ্যাডভোক্যাসি কার্যক্রমকে আরো বিস্তৃত করতে হবে।

নির্যাস ২০১১ আগস্ট;২২:৫২-৫৪

নীলফামারী জেলার অভিজ্ঞতার আলোকে মাতৃত্বকালীন জটিলতা সম্পর্কে সুবিধাভোগীদের ধারণা এবং জরুরি সেবা পাবার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকর্মীদের ভূমিকা*

মোরশেদা বানু, হাসিমা-ই-নাসরিন ও সারওয়াত রশীদ

- উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মহিলা কমপক্ষে তিনটি মাতৃত্বকালীন জটিলতার কথা বলতে পেরেছে।
- জরুরি মাতৃত্বকালীন সেবাগ্রহণে বিলম্বের কারণ হচ্ছে আর্থিক অস্বচ্ছলতা, সনাতনী চিকিৎসা, রোগের জটিলতা বুঝতে না পারা, খানা প্রধান না থাকা ও জরুরি ব্যবস্থাপনার অভাব।

সূচনা

গরীব ও সুবিধাবঞ্চিত নারী এবং শিশুর জন্য স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে নীলফামারী জেলায় ২০০৫ সালের শেষের দিকে ব্র্যাক Maternal, Neonatal and child Health Project (MNCH) বা মা, নবজাতক ও শিশুস্বাস্থ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করে। এই প্রকল্পের আওতায় গরীব ও সুবিধাবঞ্চিত গ্রামীণ জনগণকে এ বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান দান এবং জরুরি মুহুর্তে করণীয় সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির প্রয়াস চালানো হয়। এই গবেষণার লক্ষ্য ছিল মাতৃত্বকালীন জটিলতা সম্পর্কে সুবিধাভোগীদের ধারণা বা জ্ঞান কতখানি সে সম্পর্কে অনুসন্ধান চালানো, অত্যাবশ্যকীয় মাতৃত্বকালীন যত্ন পাবার ক্ষেত্রে MNCH কার্যক্রমের ভূমিকা নির্ধারণ এবং এ সেবা প্রাপ্তির বিলম্বের কারণগুলো নিরূপণ করা।

* 'Stakeholders' knowledge in obstetric complications and role of health providers in accessing emergency obstetric experiences from Nilphamari district' (2010) শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ। সার-সংক্ষেপ করেছেন আলতামাস পাশা।

গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণাটি ২০০৭ সালের মে-জুন মাসে অনুষ্ঠিত হয়। মাতৃত্বকালীন জটিলতা সম্পর্কিত ৪২টি কেস এই গবেষণার অন্তর্ভুক্ত ছিল। নীলফামারী জেলার তিনটি উপজেলায় ১৮ জন কমিউনিটি স্বাস্থ্যকর্মী এই গবেষণার আওতাধীন ছিলো। নিবিড় সাক্ষাৎকার-এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দলগতভাবে আলোচনা করা হয় এবং উল্লেখিত ১৮ জন কমিউনিটি স্বাস্থ্যকর্মীর সাথে অনানুষ্ঠানিক আলোচনা করা হয়।

গবেষণালব্ধ ফলাফল

গবেষণালব্ধ ফলাফল থেকে দেখা যায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মহিলা কমপক্ষে তিনটি মাতৃত্বকালীন জটিলতার কথা উল্লেখ করতে পেরেছে। তবে তাঁদের পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের এ সংক্রান্ত জ্ঞান ছিল অপর্যাপ্ত। অন্যদিকে কমিউনিটি স্বাস্থ্যকর্মীদের মাতৃত্বকালীন জটিলতা বিষয়ে জানার স্তর ছিল মধ্যমমানের। কমিউনিটি স্বাস্থ্যকর্মীরা ৩৬ জন মহিলাকে চিকিৎসার জন্য উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র, জেলা হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠায় এবং জরুরি মাতৃত্বকালীন সেবা গ্রহণে (emergency obstetric care) সহায়তা দেয়।

গবেষণায় আরো দেখা যায়, জরুরি মাতৃত্বকালীন সেবাগ্রহণে বিলম্বের কারণসমূহ হচ্ছে আর্থিক অস্বচ্ছলতা, সনাতনী চিকিৎসা, রোগের জটিলতা বুঝতে ব্যর্থতা, খানা প্রধান না থাকা এবং জরুরি ব্যবস্থাপনার অভাব। সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। উনিশজন অংশগ্রহণকারীর ক্ষেত্রে এমনটা দেখতে পাওয়া যায়। চিকিৎসকদের জরুরি মাতৃত্বকালীন জটিলতা সম্পর্কে কোন প্রশিক্ষণ না থাকায় এগারোজন মহিলা বিলম্বে চিকিৎসা সেবা পায়। এক্ষেত্রে জরুরি অস্ত্রপচার ও ব্ল্যাড ব্যাংক-এর ব্যবস্থা যেমন ছিল না, তেমনি ছিল না প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষার সুব্যবস্থা ও রোগী পরিবহণের জন্য প্রয়োজনীয় যানবহনের সুবিধা।

সুপারিশসমূহ

মা ও নবজাতকের স্বাস্থ্যের উন্নতিবিধানে এই কার্যক্রমে গর্ভবতী মায়েদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সচেতন করতে হবে। এক্ষেত্রে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের বিশেষত স্বামীদের আরো সচেতন করে তুলতে হবে। প্রসবকালীন স্বাস্থ্যসেবা দেয় এমন স্বাস্থ্যকর্মীদের কর্মদক্ষতা বাড়াতে হবে যাতে তাঁরা গুরুতর অসুস্থতাসমূহ সনাক্ত করতে পারে, সঠিক চিকিৎসা সেবা পাবার জন্য সংশ্লিষ্ট রোগীকে উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র, জেলা হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠাতে পারে এবং স্থানীয় পরিবহণ ব্যবস্থার মাধ্যমে রোগীদের স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পাঠাতে সহায়তা করতে পারে। এমনটা করা গেলে উক্ত স্বাস্থ্যকর্মীরা মাতৃত্বকালীন জটিলতায় তাঁদের কার্যাবলী যথাযথভাবে পালনে সক্ষম হবে।

 নির্যাস ২০১১ আগস্ট;২২:৫৫-৫৯

উন্নত পয়ঃনিষ্কাশনে ব্র্যাক ওয়াশ কর্মসূচির প্রভাব: বেইজলাইন থেকে মিডলাইন জরিপের পরিবর্তনসমূহ*

শ্যামল সি ঘোষ, একেএম মাসুদ রানা, এআরএম মেহরাব আলী ও তাহমিদ আরিফ

- ওয়াশ কর্মসূচির মাঝামাঝি সময়ে খানা পর্যায়ে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ব্যবহার তাৎপর্যপূর্ণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ওয়াশ কর্মসূচির কার্যক্রমের কারণে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ব্যবহার বৃদ্ধি পেলেও, কিছু কিছু খানার মানুষ এটা ব্যবহার না করে পুনরায় অস্বাস্থ্যকর ব্যবস্থায় ফিরে যায়, ওয়াটার-সিল যুক্ত পায়খানা স্থাপন ও ব্যবহার কষ্টসাধ্য হবার কারণে।
- অতিদরিদ্রদের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার না করার প্রবণতা আগের মতই দেখা গেছে।
- বিদ্যমান সাফল্যকে ধরে রাখতে হলে ওয়াশ কর্মসূচিতে সচেতনতামূলক কার্যক্রম আরো বৃদ্ধি করতে হবে এবং অতিদরিদ্র, দরিদ্র ও সাক্ষরহীন খানাসমূহের প্রধানকে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নির্মাণে ও ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

পটভূমি

বাংলাদেশে সরকারি এবং বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা সার্বিকভাবে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নে কাজ করছে। তাদের লক্ষ্য হচ্ছে ২০১৩ সালের মধ্যে পয়ঃনিষ্কাশনে ১০০% জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা। পয়ঃনিষ্কাশন সেবা নিশ্চিত

* 'Effects of BRAC water, sanitation and hygiene (WASH) programme in improved sanitation: changes from baseline to midline survey' (২০১০) শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ। সার-সংক্ষেপ করেছেন আলতামাস পাশা।

করতে, স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদানে এবং নিরাপদ পানি সরবরাহে সহায়তা প্রদানে ব্র্যাক ওয়াটার, স্যানিটেশন এন্ড হাইজিন (WASH বা ওয়াশ) কর্মসূচি ২০০৬ সাল থেকে ১৫০টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। ব্র্যাকের গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ ওয়াশ কর্মসূচির মূল্যায়নে ২০০৬ সালে বেইজলাইন এবং ২০০৯ সালে মিডলাইন জরিপ পরিচালনা করে। দু'টি জরিপ থেকে পাওয়া উপাত্ত নিয়ে একটি তুলনামূলক মূল্যায়ন করা হয়।

উদ্দেশ্যসমূহ

এই গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল পয়ঃনিষ্কাশনের ক্ষেত্রে ব্র্যাক ওয়াশ কর্মসূচির মাঝামাঝি পর্যায়ের প্রভাব নিরূপণ করা। এক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে দেখা হয় –

১. খানা এবং প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে পয়ঃনিষ্কাশনের ক্ষেত্রে উন্নতির পরিমাণ, এবং

২. নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনে এই কর্মসূচির কোন কোন বিষয়ে আরো প্রাধান্য দিতে হবে।

গবেষণা পদ্ধতি

ব্র্যাক ওয়াশ কর্মসূচি ২০০৬ সাল থেকে তিনটি ধাপে পরিচালিত হচ্ছে। মিডলাইন জরিপ পরিচালনা করার জন্য প্রথম ধাপের ৫০টি উপজেলা নির্বাচন করা হয়েছিল। এসব উপজেলার ৩০,০০০ খানায় ২০০৬ সালে বেইজলাইন ও ২০০৯ সালে একই খানাগুলোতে মিডলাইন জরিপ করা হয়েছিল। এক্ষেত্রে নির্ণায়ক হিসেবে ছিল স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ব্যবহার, এর মান, শিশুদের মল-মূত্র ত্যাগের অভ্যাস, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার মালিকানা, নির্মাণের জন্য অর্থের উৎস, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করা ও না করার কারণসমূহ নির্ধারণ, স্বাস্থ্য ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কিত জ্ঞান কেমন রয়েছে এবং তা পালনের অভ্যাস। এছাড়াও, বেইজলাইন জরিপে ২,৩৯৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত ছিল। এদের মধ্যে ১,৪৮৭টি মিডলাইন জরিপের সময় পুনঃঅন্তর্ভুক্ত হয়। এক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ব্যবহার, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এরূপ পায়খানার সুবিধা প্রদান, মেয়েদের জন্য মাসিকের সময় স্যানিটেশন সুবিধা প্রদান যাতে স্যানিটারি ন্যাপকিন তারা একটি নির্দিষ্ট স্থানে ফেলতে পারে, স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা

অভ্যাস করা এবং ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক উভয়ের জন্য শিক্ষাসংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক সুযোগ-সুবিধার তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়।

গবেষণালব্ধ ফলাফল

মিডলাইন জরিপে বেইজলাইন জরিপের তুলনায় স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ব্যবহার তাৎপর্যপূর্ণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে দেখা যায় যে অ-দরিদ্রখানার চেয়ে অতিদরিদ্র এবং দরিদ্র খানাগুলোয় এই ব্যবহার বেশি ছিল। এটা ওয়াশ কর্মসূচির কার্যক্রমের প্রভাবকে তুলে ধরেছে।

ওয়াশ কর্মসূচির কার্যক্রমের কারণে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ব্যবহার বৃদ্ধি পেলেও, কিছু কিছু খানার মানুষকে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার থেকে পুনরায় অস্বাস্থ্যকর পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থায় ফিরে যেতে দেখা গেছে। যেমন, এখন তারা রিং-স্লাব ল্যাট্রিন এবং অস্বাস্থ্যকর পায়খানা ব্যবহার করছে। এভাবে কর্মসূচির অর্জন যাতে নিম্নগামী না হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আরো উন্নতির জন্য যথেষ্ট প্রয়াস চালাতে হবে। ওয়াটার-সিল ল্যাট্রিনের ব্যবহার খানাসমূহে কষ্টসাধ্য হিসেবে পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে প্রতিবার পায়খানা ব্যবহারে প্রচুর পানি ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। ব্যবহারকারীদের অনীহার কারণে ও যত্নের অভাবে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা বসানোর সময়েই অথবা পরে ওয়াটার-সিল ভেঙ্গে যায়।

দেখা গেছে যে, বেইজলাইনের তুলনায় মিডলাইনে পায়খানার মানের উন্নয়ন ঘটেছে। মিডলাইন জরিপে ৫০.৮% বেশি পরিস্কার পায়খানা পাওয়া যায়, যা বেইজলাইনে ছিল ৩৩.৬%। মিডলাইন জরিপে পায়খানা থেকে দুর্গন্ধ আসার হার কমে দাঁড়ায় ৪৮% যা বেইজলাইনে ছিল ৬২.৮%।

মলের অবশিষ্ট অংশ রয়েছে এমন পায়খানা পাওয়া গেছে মিডলাইন জরিপে ৩৫.২% এবং বেইজলাইন জরিপে ৪৮%। পায়খানার ভেতরে অথবা কাছাকাছি পানি রাখা হয় এমন পায়খানা পাওয়া গেছে ৩৭.৯% মিডলাইন জরিপে এবং ৩২.৪% বেইজলাইন জরিপে। মিডলাইন জরিপের সময় আরো দেখা যায় যে, গ্রাম ওয়াশ কমিটির মাধ্যমে ব্র্যাক ওয়াশ কর্মসূচি যে সচেতনতামূলক কার্যাবলী

পরিচালনা করেছে তার ফলে এবং মহিলাদের কার্যকর অংশগ্রহণের কারণে শিশুদের মধ্যে এটা সম্ভব হয়েছে।

সকল অর্থনৈতিক অবস্থার খানার ক্ষেত্রেই স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার মালিক হবার হার বেইজলাইন থেকে মিডলাইন জরিপে বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও এক্ষেত্রে অ-দরিদ্র খানার চেয়ে অতিদরিদ্র এবং দরিদ্র খানার সংখ্যা বৃদ্ধি ছিল বেশি। স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপনে অর্থের উৎস বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নিজস্ব হলেও মিডলাইন জরিপে দেখা যায় যে, এনজিওদের কাছ থেকে ঋণ নেওয়ার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। খানাসমূহে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারের প্রধান কারণ ছিল স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা ভাবনা ও সচেতনতা। অন্যদিকে বেইজলাইন ও মিডলাইন উভয় জরিপের ক্ষেত্রেই দেখা গেছে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন না করা বা ব্যবহার না করার প্রধান কারণ ছিল আর্থিক দৈন্যতা।

অ-দরিদ্রদের তুলনায় অতিদরিদ্রদের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার না করার প্রবণতা উভয় জরিপের ক্ষেত্রেই দেখা গেছে। আর্থিক দূরাবস্থা, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারে প্রচারণা সম্পর্কে অবহিত না থাকা বা খানা প্রধানের শিক্ষার অভাবও এক্ষেত্রে প্রভাব ফেলেছে। বেইজলাইন জরিপের সময় স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার না করার ক্ষেত্রে পুরুষ প্রধান খানার প্রবণতা ছিল মহিলা প্রধান খানার চেয়ে বেশি। তবে এই প্রবণতা মিডলাইন জরিপে দেখা যায় নি।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ব্যবহার (নির্মাণ সহ) মিডলাইনে কিছুটা বেড়েছে (৭০% বনাম ৭৩%)। এছাড়াও, মানসম্মত পায়খানার নির্ণায়কসমূহ মিডলাইন জরিপের সময়ে পরিবর্তিত হয়েছে। এটা গুণগত মানের পরিবর্তনের একটি নির্দেশক। মাসিককালীন ছাত্রীদের বিদ্যালয়ে অনুপস্থিতির হার বেইজলাইনের ৪৪% থেকে হ্রাস পেয়ে মিডলাইনে ২৯% হয়েছে।

বেইজলাইন জরিপে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটা ক্ষুদ্রাংশের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত স্যানিটারি ন্যাপকিন ফেলার নির্দিষ্ট স্থান শনাক্ত করা গেছে যা মিডলাইন জরিপে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বৃদ্ধির হার মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে এবং মাদ্রাসাগুলোতে বেশি ছিল। স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা পরিস্কার কী না তা পর্যবেক্ষণে ব্যবহৃত নির্ণায়কসমূহের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে।

সুপারিশসমূহ

খানা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্র্যাক ওয়াশ কর্মসূচির ইতিবাচক প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে। অবশ্য এক্ষেত্রে এখনও বহু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যেমন, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারকারী খানার মানুষ স্থান পরিবর্তন করে এমন স্থানে চলে যায় যেখানে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার সুবিধা নেই, বরং ওয়াটার-সিল অপসারণ, দরিদ্রতা এবং সাক্ষরতার অভাব রয়েছে। এসব সমস্যার কারণে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারের হার হ্রাস পায় এবং কর্মসূচির সাফল্য চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। এক্ষেত্রে বিদ্যমান সাফল্যকে ধরে রাখতে হলে সচেতনতামূলক কার্যক্রম আরো বাড়াতে হবে ও অতিদরিদ্র, দরিদ্র এবং সাক্ষরহীন খানাসমূহের প্রধানকে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নির্মাণে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। দিতে হবে আরো বেশি অর্থনৈতিক সহায়তা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহেও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত শিক্ষার পাশাপাশি স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নির্মাণে আর্থিক সহায়তা দিতে হবে।

© BRAC
নির্যাস ২০১১ আগস্ট;২২:৬০-৬২

স্বাস্থ্য সুরক্ষায় গ্রামাঞ্চলের মহিলাদের সাবান দিয়ে হাত ধোওয়ার প্রবণতা বেড়েছে*

একেএম মাসুদ রানা, মিলন কান্তি বড়ুয়া ও বাবর কবির

- ধনী-গরিব নির্বিশেষে প্রায় সবধরনের খানার ক্ষেত্রে সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার প্রবণতা বেড়েছে।
- গ্রাম ওয়াশ কমিটির সভায় যাঁরা অংশ নিয়েছিলেন তাদের মধ্যে এ প্রবণতা বেশি দেখা গেছে।

শৌচকর্ম সম্পাদন ও ময়লা পরিষ্কার ইত্যাদি কাজ করার পরে এবং খাওয়া, রান্না ও খাবার পরিবেশনের আগে সাবান দিয়ে হাত ধোয়া স্বাস্থ্য রক্ষায় প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করে। কারণ অপরিস্কার হাত নানা প্রকার রোগ-জীবাণু বহন করে। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা যায় অনেকেই শৌচকর্মের পরে এবং খাবার গ্রহণের আগে হাত ধোয়ার ক্ষেত্রে সাবান ব্যবহার করে না। ফলে তাঁরা বিভিন্ন ধরনের অসুখে আক্রান্ত হতে পারে। এই ক্ষেত্রে সাবান ব্যবহার না করার কারণগুলো হচ্ছে দীর্ঘদিনের অভ্যাস, রোগ সংক্রমণ সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব, সাবান কেনার সামর্থ না থাকা ইত্যাদি।

স্বাস্থ্যসম্মতভাবে হাত ধোয়া যে জনস্বাস্থ্যের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা অনুধাবন করে ২০০৮ সালে জাতিসংঘ বিশ্বব্যাপী 'বৈশ্বিক হস্ত ধৌতকরণ দিবস' উদযাপনের উদ্যোগ নেয়। সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি এবং রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ার প্রতি গুরুত্বারোপের জন্য প্রতিবছর এই দিবসটি উদ্‌যাপিত হচ্ছে।

* 'Measuring changes in self-reported hand-washing practices with soap among women: a community based empirical study in rural Bangladesh' (২০১০) শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ। সার-সংক্ষেপ করেছেন আলতামাস পাশা।

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায় নিম্ন আয়ের দেশগুলোতে সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার অভ্যাসের উপর তেমন একটা কাজ হয় নি। ব্র্যাক পাঁচবছর মেয়াদী ওয়াটার, স্যানিটেশন এন্ড হাইজিন (WASH বা ওয়াশ) কর্মসূচি ১৫০টি উপজেলায় পরিচালনা করছে। এই কর্মসূচির আওতাধীন এলাকায় স্যানিটেশন সুবিধাদি জাতীয় স্যানিটেশন আওতাধীন এলাকার চেয়ে কম ছিল। প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে কমিউনিটি স্তরে ও সামাজিক, ধর্মীয় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। আর্থিক সহায়তা দিয়েছে নেদারল্যান্ড সরকার।

আলোচ্য গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল ব্র্যাকের ওয়াশ কর্মসূচির ফলে সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার ক্ষেত্রে মহিলাদের মাঝে কী ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে তা দেখা। এই কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল টিউবওয়েল, স্যানিটারি ল্যাট্রিন এবং উন্নত স্বাস্থ্যসেবার উপর সচেতনামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা। এক্ষেত্রে সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার কাজটি হাতেকলমে করে দেখানো হয়। গ্রামের অতিদরিদ্র খানাসমূহ স্যানিটারি ল্যাট্রিনের জন্য অনুদান পায়। এই কার্যক্রম পরিচালিত হয় গুচ্ছ সভা, জুম্মার নামাজের খুতবার মাধ্যমে, খানায় খানায় ব্যক্তিগতভাবে গিয়ে স্বাস্থ্য সচেতনতা প্রদান এবং ব্র্যাকের গণনাটকের মাধ্যমে। ওয়াশ কার্যক্রমকে সহজ করতে গ্রাম ওয়াশ কমিটিও গঠন করা হয়।

গবেষণালব্ধ ফলাফল

গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন ধরনের কাজ করার পরে সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার অভ্যাস অতি দরিদ্র, দরিদ্র এবং দরিদ্র নয় এমন খানার ক্ষেত্রে যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে এক্ষেত্রে কতিপয় কাজের আগে সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার প্রবণতা তেমন উৎসাহজনক নয়, যেমন খাবার গ্রহণের পূর্বে, রান্নার সময়, খাবার পরিবেশনের সময়, এবং গৃহস্থালীর ময়লা আবর্জনা পরিস্কারের পরে।

উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় অদরিদ্র এবং অক্ষরজ্ঞানসম্পন্নদের ক্ষেত্রে সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার প্রবণতা বেশি ছিল, আর যারা স্যানেটারি ল্যাট্রিন ব্যবহার করে না তাদের ক্ষেত্রে প্রবণতা কম ছিল। যেসব অংশগ্রহণকারী গ্রাম ওয়াশ কমিটির সভায় অংশ নিয়েছিল তাদের মধ্যে সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার প্রবণতা বেশি ছিল।

উপসংহার

সময়ের সাথে সাথে বিভিন্ন ধরনের কাজের আগে ও পরে সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার অভ্যাস বৃদ্ধি পেয়েছে। অতিদরিদ্রদের মধ্যে স্বাস্থ্যসচেতনতা যেমনি বেড়েছে তেমনি স্বাস্থ্যবিধি পালন করার প্রবণতাও যথেষ্ট বেড়েছে। অতিদরিদ্র খানাসমূহ বিনামূল্যে স্যানিটারি ল্যাট্রিন পেয়ে থাকে, হয়ত এ কারণেই এই অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ উভয়ই পানিবাহিত রোগদমনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেসব ক্ষেত্রে ব্যক্তি পর্যায়ে স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাস পালন খুব নিম্নমানের সেসব ক্ষেত্রে পানিবাহিত রোগ হ্রাসে স্যানিটেশনের ভূমিকাও খুব কম থাকে। স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাস অনুকূল অবস্থানে থাকলে বিভিন্ন রোগবালাই থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। আমাদের মতো নিম্ন আয়ের দেশে মহিলারা শিশু লালন-পালনে, রান্নায়, খাবার পরিবেশনে এবং গৃহস্থালীর বর্জ্য পরিষ্কার-এ মুখ্য ভূমিকা পালন করে। তাই, মহিলাদের অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন তাদের নিজেদের মধ্যে যেমন বিভিন্ন রোগের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়, তেমনি পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও নিত্য ঝুঁকিতে থাকেন। আর শিশুরা বিশেষভাবে এই ঝুঁকিতে থাকে। কারণ পানিবাহিত রোগ শিশুদের মধ্যে সহজেই সংক্রমিত হতে পারে।

বেইজলাইন থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত ও আলোচ্য গবেষণার ফলাফলের আলোকে এটা বলা যায় যে, অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছে তা ব্র্যাক ওয়াশ কর্মসূচি বাস্তবায়নের কারণেই ঘটেছে। এ গবেষণা থেকে এ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, ওয়াশ কর্মসূচির কার্যক্রম অব্যাহত রাখলে সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার অভ্যাস বৃদ্ধি পাবে। সার্বজনীন এ অভ্যাস অনেক ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ হ্রাস করে এর সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে সহায়ক হবে। এভাবে জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার কতিপয় লক্ষ্যও পূরণ করা সম্ভব হবে।

বাংলাদেশে জিংক অপুষ্টি ও হারভেস্টপ্লাস কার্যক্রম

মাহবুব হোসেন ও রেজাউল করিম*

- পরিমাণে অনেক কম খেতে হয় বলে জিংককে অনুপুষ্টি বলা হয়। এর অভাবে মানবদেহে মারাত্মক ক্ষতি হয়।
- বাংলাদেশের কৃষি প্রজননবিদরা জিংক সমৃদ্ধ উন্নত ফলনশীল একটি ধানের জাত আবিস্কারের কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন।

জিংক বা দস্তা মানবদেহের জন্য একটি অতি প্রয়োজনীয় পুষ্টি উৎপাদন। নারী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ - সবার জন্যই জিংক প্রয়োজন। একজন সুস্থ এবং প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের জন্য প্রতিদিন প্রায় ৪ মিলিগ্রাম, একজন প্রাপ্তবয়স্ক মহিলার জন্য প্রায় ৩ মিলিগ্রাম, একজন শিশুর জন্য ১-৩ মিলিগ্রাম ও একজন বাড়ন্ত শিশুর জন্য ৩-৫ মিলিগ্রাম জিংক প্রয়োজন। একজন গর্ভবতী মহিলার জন্য দৈনিক প্রায় ৩-৬ মিলিগ্রাম এবং প্রসূতি মহিলার জন্য দৈনিক প্রায় ৬ মিলিগ্রাম জিংক প্রয়োজন হয়। স্বাভাবিক খাদ্যে প্রাণিজ আমিষের পরিমাণ কম থাকলে জিংক গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা প্রায় তিনগুণ বেড়ে যায়। আমাদের দেহে যথেষ্ট পরিমাণ গ্রহণযোগ্য জিংক জমা রাখা যায় না বলে সবারই প্রায় প্রতিদিন কিছু না কিছু জিংক সমৃদ্ধ খাবার খেতে হয়।

পরিমাণে অনেক কম খেতে হয় বলে জিংককে অনুপুষ্টি (Micronutrient) বলা হয়। এরই অভাবজনিত অপুষ্টিতে মানবদেহে মারাত্মক ক্ষতিসাধিত হতে পারে। ছোট বাচ্চা এবং শিশুদের শরীরে জিংক-এর অভাব হলে তাদের শারীরিক বৃদ্ধি হ্রাস পায়। ফলে তারা চিরদিনের জন্য বয়সের তুলনায় খাটো (Stunted) হয়ে যেতে পারে। জিংক একটি রোগ প্রতিরোধক অনুপুষ্টি। এর অভাবে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়, রোগ-বালাইয়ের আক্রমণ বেড়ে যায় এবং তা থেকে

* বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, অষ্টবিংশপাতিতম খণ্ড, বার্ষিক সংখ্যা ১৪১৭ থেকে সংকলিত ও সংশোধিত।

মৃত্যুও ঘটতে পারে। গর্ভবতী ও প্রসূতি মহিলাদের জন্য জিংকের অভাব খুবই মারাত্মক। এক্ষেত্রে প্রসব সমস্যা বেড়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে এবং তা থেকে মা এরং নবজাতকের মৃত্যুও ঘটতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে নবজাতকের ওজন কম হতে পারে এবং পরবর্তী সময়ে তাদের বিভিন্ন পরিচর্যা যেমন, পুষ্টি সুরক্ষা, রোগ-বালাই দমন, শারীরিক বৃদ্ধি ইত্যাদি অনেক কঠিন ও ব্যয়সাধ্য হয়ে পড়ে। খাদ্যে জিংকের অভাব এবং অপুষ্টি ও স্বাস্থ্যহীনতার উপর তার প্রভাব সংক্রান্ত গবেষণা অতি সাম্প্রতিক ঘটনা। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের মতো বাংলাদেশেও জিংক স্বল্পতার হার কত তার সুনির্দিষ্ট হিসাব এখনও পাওয়া যায় নি। তবে পারিবারিক খাদ্যগ্রহণ, শিশু অপুষ্টির হার, জন্ম ওজন ইত্যাদি বিবেচনা করে বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেক পরিবার এবং অর্ধেক শিশু জিংক স্বল্পতায় ভুগছে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সংজ্ঞা অনুযায়ী কোনো দেশের শতকরা ২০ ভাগ শিশু বয়সের তুলনায় খাটো হলেই সে দেশে সার্বিকভাবে জিংক স্বল্পতা বিরাজ করছে বলে ধরে নেওয়া হয়। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী বিশ্বের তীব্র জিংক সংকটভুক্ত অঞ্চলগুলোর মধ্যে বাংলাদেশও রয়েছে। জিংক স্বল্পতার এই অভিশাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার প্রধান উপায় হল জিংক সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া। মাছ, মাংস ইত্যাদি প্রাণিজ খাদ্যে যথেষ্ট পরিমাণে জিংক রয়েছে। এ ছাড়া কিছু কিছু ডাল ও বাদাম জাতীয় খাদ্যেও রয়েছে জিংক। কিন্তু উদ্ভিদ জাতীয় খাদ্য যেমনঃ ভাত, আটা, আলু ও শাকসবজিতে জিংকের পরিমাণ খুবই কম। প্রাণিজ খাবার মাছ ও মাংসের মূল্য অনেক বেশি। আমাদের দেশে অধিকাংশ দরিদ্র পরিবার প্রতিদিন এসব খাদ্য যথেষ্ট পরিমাণে খেতে পায় না। কাজেই ঐ সকল পরিবারেই জিংক অপুষ্টির হার অনেক বেশি।

আশার কথা এই যে, হারভেস্টপ্লাস (w.w.w.harvestplus.org) বিশ্বব্যাপী এই সমস্যাটির সুলভ এবং সহজ সমাধানের জন্য এগিয়ে এসেছে। হারভেস্টপ্লাস আন্তর্জাতিক গবেষণা গ্রুপ সিজিআইএআর[১]-এর অন্তর্ভুক্ত একটি আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রকল্প। এই প্রকল্প ২০০৩ সালে কার্যক্রম শুরু করে এবং ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত আন্তর্জাতিক খাদ্যনীতি গবেষণা প্রতিষ্ঠান (ইফরি)[২] ও কলম্বিয়ায়

---

[১] CGIAR- Consultative group on International Agricultural Research (কৃষি গবেষণায় কার্যরত কতিপয় আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের একটি নেটওয়ার্ক)

[২] IFPRI- International Food Policy Research Institute (আন্তর্জাতিক খাদ্যনীতি গবেষণা প্রতিষ্ঠান), Washington, DC, USA

অবস্থিত আন্তর্জাতিক উষ্ণ অঞ্চলীয় কৃষি গবেষণা কেন্দ্র (সিয়াট)[৩]-এর যৌথ তত্ত্বধানে পরিচালিত। বিশ্বের ৪০টি দেশের ৬০টি প্রতিষ্ঠানের ২০০ জনেরও বেশি বিজ্ঞানী এই প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রজননের মাধ্যমে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর প্রধান খাদ্য দ্রব্যে অনুপুষ্টির (লৌহ, জিংক ও ভিটামিন-এ) পরিমাণ বৃদ্ধি করা।

বর্তমান বিশ্বের নয়টি দেশের সাতটি প্রধান খাদ্যশস্যে এই অনুপুষ্টি সমৃদ্ধকরন কাজ চলছে। দেশ, ফসল ও অনুপুষ্টিগুলো হল: উগান্ডা ও মোজাম্বিকে মিষ্টি আলুতে ভিটামিন এ; রুয়ান্ডা ও কঙ্গোতে ডাল জাতীয় খাদ্য ও শীমে লৌহ; জাম্বিয়ায় ভুট্টায় ভিটামিন এ; ভারতে বজরায় লৌহ ও জিংক; কঙ্গো ও নাইজেরিয়ায় কাসাভাতে ভিটামিন এ; ভারত ও বাংলাদেশে ধানে জিংক এবং ভারত ও পাকিস্তানে গমে জিংক। এই খাদ্য শস্যগুলো ঐসব দেশের প্রধান খাদ্য। তুলনামূলকভাবে এই খাদ্যশস্যগুলোর দাম কম এবং ধনী-দরিদ্র সবাই এই খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। ফলে সকলেই এর সুবিধা ভোগ করতে পারবে ।

আমরা জানি, দরিদ্র জনগোষ্ঠী অবস্থাপন্ন শ্রেণীর তুলনায় প্রধান খাদ্যসমূহ বেশি পরিমাণে খায়। কারণ তা মাছ, মাংস ও শাকসবজির তুলনায় সস্তা এবং ক্ষুধা নিবারণের জন্য অপরিহার্য। স্বভাবতই এই উদ্ভাবনটি দরিদ্রবান্ধব, ব্যয়সাশ্রয়ী ও টেকসই। ইতিমধ্যে বাংলাদেশে এই গবেষণায় যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। আমাদের দেশের কৃষি প্রজননবিদগণ জিংক সমৃদ্ধ উন্নত ফলনশীল একটি ধানের জাত আবিষ্কারের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন। এই উদ্ভাবনটি করা হয়েছে গতানুগতিক প্রক্রিয়ায় জিংক সমৃদ্ধ জাতের সঙ্গে উচ্চ ফলনশীল জাতের সংমিশ্রণের মাধ্যমে। এটি কোনো GMO[৪] প্রযুক্তি নয়, যার বিরোধিতা আমাদের সুশীল সমাজের একাংশ করে থাকেন। জিংক অপুষ্টি দূরীকরণে এই ধানের কার্যকারিতা সম্পর্কেও নানাবিধ গবেষণা চলছে এবং ইতিমধ্যেই অনেক আশাব্যঞ্জক ফল পাওয়া গেছে। আশা করা যায় যে, ২০১৪ সাল নাগাদ এমন একটি ধানের বীজ চাষাবাদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া সম্ভব হবে।

---

[৩] CIAT- International Centre for Tropical Agriculture (গ্রীষ্মমণ্ডলীয় কৃষি বিষয়ে গবেষণারত একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান), Cali, Colombia

[৪] GMO- Genetically Modified Food (জিন প্রকৌশলের মাধ্যমে উদ্ভাবিত খাদ্য)

নির্যাসের পূর্ববর্তী খণ্ডে প্রকাশিত নিবন্ধসমূহ

খণ্ড ২১ ডিসেম্বর ২০১০

সম্পাদকীয়: দারিদ্র্য ও আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য নিরসন দিবস
সাম্প্রতিক খবর
মায়ের গর্ভকালীন বিষণ্নতা স্বাভাবিকের চেয়ে কম ওজনের শিশু জন্মের জন্য দায়ী
মাধ্যমিক শিক্ষা: মান ও সমতাসংক্রান্ত চ্যালেঞ্জসমূহ
বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘন: ব্র্যাক সামাজিক কর্মসূচি কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে গবেষণামূলক অনুসন্ধান
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের চাকরিচ্যুত কর্মীদের জন্য ব্র্যাকের সামাজিক নিরাপত্তা প্যাকেজ: একটি সার্বিক মূল্যায়ন
অতিদরিদ্রদের জন্য ব্র্যাকের নিরাপদ পানি, স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন এবং স্বাস্থ্যবিধি (ওয়াশ) কর্মসূচির একটি মূল্যায়ন

অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার উপর সম্পদ হস্তান্তরের প্রভাব

ব্র্যাক উগান্ডা গবেষণা ইউনিটের বিকাশ ও বিভিন্ন কার্যক্রম

পার্বত্য চট্টগ্রামের দীঘিনালা উপজেলায় ম্যালেরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব

প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী কেন্দ্রগুলোতে সুযোগ-সুবিধা পাবার ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের প্রাপ্যতা ও যথোপযুক্ত ব্যবহার: বাংলাদেশ কেমন করছে?

দাঁত ও মুখের যত্ন সম্পর্কে পল্লী এলাকার জনগণের ধারণা: একটি পাইলট জরিপ

খণ্ড ২০ জুন ২০১০

সম্পাদকীয়
সাম্প্রতিক খবর
বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা: অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জসমূহ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রণীত প্রাথমিক স্তরের গণিত পাঠ্যপুস্তকসমূহের একটি পর্যালোচনা
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) প্রণীত বাংলা বইয়ে প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের শ্রেণীভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতার প্রতিফলন: একটি পর্যালোচনা
গ্রামীণ বাংলাদেশে পয়ঃনিষ্কাশনে বন্যার প্রভাব: একটি মূল্যায়ন
মানবাধিকার এবং আইন-সম্পর্কিত শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্র্যাকের মানবাধিকার ও আইন সহায়তা কর্মসূচি
গ্রামীণ নারীদের বিচার পাবার পথ সুগম করতে ব্র্যাকের মানবাধিকার ও আইন সহায়তা কর্মসূচি পরিচালিত বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার প্রভাব
লাইবেরীয়া ও সিয়েরা লিওনে ব্র্যাকের গবেষণা কার্যক্রম
কাছে দেখতে সমস্যা হয় এমন রোগীদের জীবনমান উন্নয়নে ব্র্যাকের চশমা প্রকল্প
গ্রাম বাংলায় যক্ষ্মার চিকিৎসা নেয়ার ক্ষেত্রে বাধা-বিপত্তিসমূহ
বাংলাদেশে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব: ২০০৭-এর বেইজলাইন জরিপ
অতি দরিদ্রদের কাছে চিকিৎসা সেবা পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে সিএফপিআর কর্মসূচির আওতাধীন প্যানেল চিকিৎসক স্কিমের একটি মূল্যায়ন।

খণ্ড ১৯ ডিসেম্বর ২০০৯

সম্পাদকীয়
সাম্প্রতিক খবর
সরকারি ও ব্র্যাক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন: একটি তুলনামূলক গবেষণা
কিশোর-কিশোরীদের জীবনমানের উন্নয়নে ব্র্যাকের কিশোর-কিশোরী উন্নয়ন কর্মসূচির প্রভাব
ব্র্যাকের বিভিন্ন ধরনের বিদ্যালয়ের মধ্যকার ফলাফলের তারতম্যের কারণ অনুসন্ধান
যৌতুক দেয়া-নেয়ার ক্ষেত্রে বিদ্যমান কারণসমূহ
তৃণমূল পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ব্র্যাকের অবদান: ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্যদের নিয়ে একটি সমীক্ষা

জেন্ডারগত ভূমিকা এবং সম্পর্কের প্রতি গ্রামের মানুষের জানার পরিধি, ধারণা এবং মনোভাবের পরিবর্তনে ব্র্যাকের জিকিউএএল কর্মসূচির একটি মূল্যায়ন

গণ নাটক ও ব্র্যাক

ব্র্যাকের কর্মসূচিসমূহ পুনঃপরিদর্শনের মাধ্যমে পরিবেশগত অবস্থার একটি মূল্যায়ন

বাংলাদেশের চা শ্রমিকদের রূপান্তর: প্রেক্ষিত কবিরপন্থী পাইনকা চা শ্রমিক

উন্নতমানের স্যানিটেশন সেবা পাবার জন্য ব্যয় করার ইচ্ছা পোষণ এবং

ব্র্যাকের পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য কর্মসূচির ক্ষেত্রে এর বাস্তবায়নগত প্রভাব নির্ধারণ

নরসিংদীর শিবপুর উপজেলায় স্যানিটারি ল্যাট্রিন ব্যবহারের বর্তমান অবস্থার একটি অনুসন্ধান

অতি দরিদ্রদের কাছে চিকিৎসা সেবা পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে সিএফপিআর কর্মসূচির আওতাধীন প্যানেল চিকিৎসক স্কিমের একটি মূল্যায়ন

যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণে গ্রাম ডাক্তারের ভূমিকা

মা, নবজাতক ও শিশুস্বাস্থ্যের উন্নয়নে নীলফামারীতে ব্র্যাকের গৃহীত পাইলট প্রকল্প: পরিবর্তনের রূপ রেখা